মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)**

৫ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা
মার্চ-২০২৩ ঈসায়ী
শাবান-রমাযান ১৪৪৪ হিজরী
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯ বাংলা

মুহাম্মদ চেং হো মসজিদ, ইন্দোনেশিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব
৫ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা

মার্চ ২০২৩ ঈসায়ী
শা‘বান-রমাযান ১৪৪৪ হিজরী
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু’মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحو ث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা “বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন

❖ বছরের মাঝে পবিত্র ও ফযীলতপূর্ণ মাসসমূহ............০৩
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ শা‘বান মাসের ফযীলত....................................০৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়

❖ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন ২০২৩ সফল হোক..............................০৯

প্রবন্ধ :

❖ সালাফী আকীদাহ বনাম অন্যান্য আকীদাহ.................১০
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ দা‘ওয়াতুন নাবাবী শর্ত ও সতর্কতা ১৫
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ মুক্তিপ্রাপ্ত দল : প্রকৃতি, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য.................১৮
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ অজানা ইতিহাস...২১
আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী
❖ সরল-পথের সন্ধান...২৩
ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ
❖ কেন আমি এই কোয়ান্টাম মেথড ত্যাগ করলাম................২৫
শেখ আহসান উদ্দিন
❖ নারীদের সিয়াম...২৯
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা

❖ কুরআন বুঝার জ্ঞান : উলূমুল কুরআন........................৩৩
সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব
❖ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন.৩৬
শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
❖ শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বস : জাতির গন্তব্য কোথায়?............৪০
মাযহারুল ইসলাম
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল...৪৪

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

বছরের মাঝে পবিত্র ও ফযীলতপূর্ণ মাসসমূহ

শাইখ মুফায্‌যল হুসাইন মাদানী❖

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

আয়াতের অনুবাদ : নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মাসসমূহের গণনা আল্লাহর নিকট বারোটি। এর মধ্যে বিশেষভাবে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সু-প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের ওপর কোনো যুলুম করো না।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, **প্রথমত :** মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারিত হয়েছে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে। فِي كِتَابِ اللَّهِ বলে বুঝানো হয়েছে যে, বিষয়টি সৃষ্টির প্রথম দিনেই তাকদীরে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুসারে লাওহে মাহফুযে লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গণনায় মাস বারোটি, অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারোটি সু-নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, যাকে কম-বেশি করার কোনো সুযোগ নেই। যদিও জাহেলীযুগের লোকেরা এতে পরিবর্তন করেছে কিন্তু তোমরা তা করতে পারবে না।[২]

তৃতীয়ত : বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন : সম্মানিত বা পবিত্র মাসগুলোর মধ্যে (যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম) তিনটি হলো ধারাবাহিকভাবে, আর একটি (রজব) হলো জমাদিউস-সানী ও শা'বানের মাঝে।[৩]

এ মর্মে আবু বাকরাহ রযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

নিশ্চয় সময় আবার ঘুরে তার আসল অবস্থায় ফিরে এসেছে। যে পদ্ধতিতে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সে দিনের মত। মাসের সংখ্যা বারোটি, তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি (যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম) পরপর। আর একটি হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস, যা জমাদিউস-সানী ও শা'বান মাসের মাঝে রয়েছে।[৪]

চতুর্থত : মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী সৃষ্টির প্রথম পর্বের নিয়মের সাথে সংগত রাখাই হলো সঠিক দীন। এতে কোনো মানুষের কম-বেশি অথবা পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।

পঞ্চমত : এটাও প্রতীয়মান হয় যে, মাসগুলোর ধারাবাহিকতা এবং যে নামে ইসলামি শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়, বরং মহান রব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মাসের ধারাবাহিকতা, নাম ও বিশেষ মাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্র মাসের হিসাবই আল্লাহর নিকটে নির্ভরযোগ্য। চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী সওম, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করা হয়ে থাকে। তবে চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমে সন-তারিখ নির্ধারণ করা জায়েয আছে, যদিও আল্লাহর নিকট চন্দ্রের হিসাব অধিকতর পছন্দনীয়।

❖ *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা*

[১] *সূরা আত্‌-তাওবা আয়াত : ৩৬*

[২] *তাফসীর কুরতুবী*

[৩] *সহীহ বুখারী-৩১৯৭, সহীহ মুসলিম হা : ১৬৭৯*

[৪] *সহীহ বুখারী হা: ৪৬৬২, সহীহ মুসলিম হা : ১৬৭৯*

দারসে গৃহীত আল্লাহর বাণীতে বিশেষ ক'টি মাসের পবিত্রতা ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন আরো কিছু মাস রয়েছে যেগুলোর আলোচনা দারসে উল্লেখিত আয়াতে নেই, তবে কুরআনুল কারীমের অন্যত্র রয়েছে। আবার এমনও মাস রয়েছে যার উল্লেখ কুরআনে নেই কিন্তু বিশ্বনবী ﷺ-এর হাদীসে আছে। যেমন, শা'বান মাস। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে সওম রাখতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি সওম বর্জন করবেন না। আবার তিনি সওম বর্জন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয় তো আর সওম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস সওম পালন করতে দেখিনি। আর আমি তাকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে অধিক (নফল) সওম রাখতে দেখিনি।[৫]

আল্লামা আমীর আল-ইয়ামানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : নাবী কারীম ﷺ-এর শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রমাযানের ফরয সিয়াম ব্যতীত অন্যান্য মাসে নফল সিয়াম পালন করা। তবে অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে বেশি করে সিয়াম পালন করতেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রমাযান মাসে সিয়াম ফরয করায় এবং কুরআন নাযিল হওয়ায় যেমন এ মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা বেড়ে গেছে, অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ শা'বান মাসে বেশি করে নফল সিয়াম পালনের কারণে শা'বান মাসের মর্যাদাও বেড়ে গেছে। উসামা বিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন : আমি রাসূল ﷺ- কে বললাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি শা'বান মাসে যত সিয়াম পালন করেন অন্য মাসে তো এত সিয়াম পালন করতে দেখি না। রাসূল ﷺ বললেন : একটি মাস আছে, যা থেকে মানুষ উদাসীন থাকে আর তা হলো রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাসে মহান রবের নিকটে আমলনামা উঠানো হয়, আর আমি চাই যে, আমার আমলনামা সিয়াম অবস্থায় উঠানো হোক। এ হাদীসের ব্যাপারে আল্লামা মুবারকপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : প্রতিদিন সকল-সন্ধ্যায় যে আমলনামা আল্লাহর নিকট উঠানো হয় এটা সে আমলনামা নয়, এটা হচ্ছে বিশেষ আমলনামা।

আর রমাযান মাসের গুরুত্ব, তাৎপর্য, মর্যাদা এবং ফযীলত সকল মাসের চেয়ে অনেক গুণে বেশি। যার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনুল কারীমে দিয়েছেন এবং রাসূল ﷺ এ মর্মে অনেক হাদীস রেখে গেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরশাদ করেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

অর্থ, রমাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।[৬] আল্লাহর বাণী - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -দ্বারা রমাযান মাসের সিয়ামকে ফরয করার মাধ্যমে এবং কুরআন নাযিলের দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাহে রমাযানকে অত্যন্ত মর্যাদা ও ফযীলতপূর্ণ করে দিয়েছেন।

এ মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে, যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন :

«إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

রমাযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দি করা হয়।[৭]

---

[৫] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৬৯, মুসলিম হা : ১১৬৫, আবু দাউদ হা : ২৪৩৪, নাসাঈ হা : ২১৭৭*

[৬] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫*

[৭] *সহীহ বুখারী হা : ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম হা : ১০৭৯*

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

যে ব্যক্তি রমাযানে ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের আশায় সওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।[৮] রাসূল ﷺ আরো বলেছেন :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

শয়তান ও দুষ্ট জিনদেরকে রমাযান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়, এর কোনো দরজা আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন, হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে।

দারসের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

১. আল্লাহ তাআলার নিকট মাসের হিসাব বারোটি। তিনি মানুষের দিন তারিখ গণনার জন্য এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২. বারো মাসের হিসাবটি নতুন কিছু নয়, বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই এ হিসাবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

৩. বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস রয়েছে, যেগুলোর বিশেষ মর্যাদা। সেগুলোতে জাহেলীযুগে যুদ্ধ-বিগ্রহসহ অন্যান্য অপকর্মও নিষিদ্ধ ছিল।

৪. কুরআনে বর্ণিত, মর্যাদাপূর্ণ মাসের পাশাপাশি আরো কিছু মাস রয়েছে, যেগুলোর মর্যাদা নবী ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যার মধ্যে রমাযান মাসও রয়েছে। যে মাসের ফযীলত সারা বছরের মধ্যে সকল মাসের চেয়ে অনেক বেশি।

৫. আল্লাহ তাআলার নিকট চন্দ্র মাসের হিসাবই হচ্ছে সঠিক এবং পছন্দনীয়, তবে সূর্যের হিসাব অনুযায়ী দিন-মাস গণনা করা জায়েয আছে।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আসুন আমরা চলমান শা'বান মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত নফল সিয়াম এবং মাসব্যাপী বেশি করে ভালো কাজ করার চেষ্টা করি। আর আসন্ন মাহে রমাযানের ফরয সিয়াম, কিয়ামুল-লাইল, লাইলাতুল কদর পালনসহ দান-খয়রাতও বেশি বেশি কল্যাণকর আমল করতে পারি, দয়াময় আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন॥ ❑❑

নতুন চাঁদ দেখার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»

তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নতুন চাঁদ দেখার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ "হে আল্লাহ আমাদের জন্য চাঁদটিকে বরকতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করো! হে নতুন চাঁদ। আল্লাহ তা'আলা আমারও প্রভু, তোমারও প্রভু।

(সুনান আত -তিরমিযী, ৩৪৫১)

---

[৮] *সহীহ বুখারী হা : ১৪২০, সহীহ মুসলিম হা : ৭৬০*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

শা'বান মাসের ফযীলত

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ، إِنْ كَانَ فِي صِيَامِهِ، وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا قَالَ: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمُ الْخَمِيسِ. قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

অনুবাদ : উসামাহ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারাবাহিকভাবে অনেক দিন সিয়াম পালন করতেন। এমনকি বলা হত, হয়ত তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না। তিনি আবার কখনো ধারাবাহিকভাবে সিয়াম ছেড়ে দিতেন, এমনকি মনে করা হত সপ্তাহে দুই দিন ছাড়া তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। তার সিয়ামের ভিতরে না পড়লেও তিনি ঐ দুই দিন সিয়াম পালন করতেন। তিনি শা'বান মাসে যত সিয়াম পালন করতেন অন্য কোনো মাসে অত সিয়াম পালন করতেন না। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোন সময় এত সিয়াম পালন করেন যে, তা আর ছাড়েন না। আবার কখনো সিয়াম এভাবে ছাড়তে থাকেন যে, (সপ্তাহে) দুই দিন ছাড়া আর সিয়াম পালন করেন না, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন সে দুই দিন? আমি বললাম : সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তিনি বললেন : ঐ দুইটি এমন দিন যাতে বিশ্বপ্রতিপালকের দরবারে বান্দার আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম পালনরত অবস্থায় আমার আমল উপস্থাপন করা হোক। আমি আবার বললাম শা'বান মাসে আপনি যত সিয়াম পালন করেন অন্য কোনো মাসে এত সিয়াম পালন করেন না। তিনি বললেন : রজব ও রমাযান মাসের মধ্যখানে তা এমন একটি মাস যা থেকে সাধারণত মানুষ গাফেল থাকে। আর তা এমন একটি মাস যাতে মহান রবের দরবারে মানুষের আমল উপস্থাপন করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম পালনরত অবস্থায় আমার আমল উপস্থাপন করা হোক।[৯]

রাবী পরিচিতি : নাম : উসামাহ ইবনু আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম : যায়দ ইবনু হারিসাহ ইবনু শারাহীল আল-কালবী। রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিব্বু রাসূলিল্লাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে সে যেন উসামাহ ইবনু যায়দকে ভালোবাসে।[১০]

তাঁর মায়ের নাম : উম্মু আয়মান যিনি রাসূল ﷺ-এর ধাত্রী মাও ছিলেন। তার জন্মসাল সঠিকভাবে জানা যায় না। উসামার দৌহিত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনু উসামাহ সূত্রে ওয়াকিদী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিল উনিশ (১৯) বছর। এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর নবুয়াতের ৪র্থ বৎসরে তিনি মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সকালে রাসূল তাকে এই গোত্রের এক মহিলার সাথে তার বিবাহ দেন, কিন্তু তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তিনি অন্যান্য মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি তাকে এক সৈন্য বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন, যে

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৯] *মুসনাদ আহমাদ হা : ২১৭৫৩, সনদ হাসান*

[১০] *তাহযীবুল কামাল- ২/৩৪২*

বাহিনীতে আবূ বকর এবং উমার ؓ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ বাহিনী প্রেরণ করার পূর্বেই রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আবূ বকর ؓ তাকে শামের দিকে প্রেরণ করলে তিনি বালকার অন্তর্গত উবনা নামক অঞ্চলের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর যায়দ ইবনু হারিসার সাথে মুতার যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। তিনি দামেস্কে আগমন করে মিঝযাহ নামক স্থানে কিছু দিন বসবাস করার পর আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তিনি ৫৪ হিজরী সালে পঁচাত্তর (৭৫) বৎসর বয়সে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ও মৃত্যু সন নিয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক সাহাবীদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বিলাল ইবনু রাবাহ, স্বীয় পিতা যায়দ ইবনু হারিসাহ এবং উম্মু সালামাহ ؓ। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস শুনেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম আবান ইবনু উসমান, ইবরাহীম ইবনু সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, স্বীয় পুত্র হাসান ইবনু উসামাহ, হুসায়ন ইবনু জুনদাব প্রমূখ।

হাদীসের ব্যাখ্যা : يَصُومُ الْأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يُفْطِرُ রাসূল ﷺ ধারাবাহিক দীর্ঘদিন সিয়াম পালন করতেন। এমনকি মনে হতো তিনি আর সিয়াম ভঙ্গ করবেন না। অর্থাৎ তিনি ﷺ একাধারে সিয়াম পালন করতেই থাকতেন, তা দেখে মনে হত যে, তিনি এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই চলতে থাকবেন, এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে আর সিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ আবার এই ধারাবাহিকতা পরিত্যাগ করে সপ্তাহে দুই দিন তথা বৃহস্পতিবার ও সোমবার ছাড়া আর সিয়াম পালন করতেন না। তাতে মনে হতো যে, তিনি আর ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করবেন না।

وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ

আপনাকে শা'বান মাসে যত সিয়াম পালন করতে দেখি অন্য মাসে অত সিয়াম পালন করতে দেখি না। অর্থাৎ অন্যান্য মাসের চাইতে শা'বান মাসে অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করেন।

আয়িশা ؓ হতে বুখারীতে এক বর্ণনায় এসেছে

فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

তিনি শা'বান মাস পুরাটাই সিয়াম পালন করতেন।[১১] মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে-

كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا .

তিনি শা'বান মাসে অল্প ক'দিন বাদে পুরাটাই সিয়াম পালন করতেন।[১২] আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ؒ এ বর্ণনাগুলোর সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মাসের অধিকাংশ সময় সিয়াম পালন করে থাকে তাহলে আরবী ভাষায় বলা যায় যে,

صام الشهر كله তিনি পুরা মাসই সিয়াম পালন করেছেন। আর এখানে পুরাটা দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ। ইমাম তীবী এ সমন্বয় প্রত্যাখান করে বলেন كله শব্দ দ্বারা তাকীদ উদ্দেশ্য। বরং তা এভাবে সমন্বয় করতে হবে যে, তিনি কখনো শা'বান মাস পুরাটাই সিয়াম পালন করতেন, আবার কোনো সময় শা'বান মাসের অধিকাংশ সময় সিয়াম পালন করতেন অথবা এর ব্যাখ্যা এভাবেও হতে পারে যে, তিনি কখনো শা'বান মাসের শুরুতে সিয়াম পালন করতেন, আবার কখনো মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিয়াম পালন করতেন আবার কখনো মাসের শেষাংশে সিয়াম পালন করতেন। অর্থাৎ সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে কোনো অংশকে নির্দিষ্ট করেননি।

এ ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য হতে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কেননা মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে -وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ রমাযান মাস ব্যতীত তিনি কোনো মাসেই সম্পূর্ণ সিয়াম পালন করেননি।[১৩]

تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ এ মাসেই (বান্দার) আমলসমূহ বিশ্বপ্রতিপালকের দরবারে উপস্থাপন করা হয়। অথচ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে দিনের আমলের পূর্বেই আল্লাহর দরবারে রাতের আমল উপস্থাপন করা হয়। অনুরূপ রাতের আমলের পূর্বেই দিনের আমল উপস্থাপন করা হয়। তাহলে শা'বান মাসে আল্লাহর

---

[১১] *সহীহ বুখারী হা: ১৯৭০*

[১২] *সহীহ মুসলিম হা : ১১৫৬*

[১৩] *সহীহ মুসলিম হা : ৭৪৬*

দরবারে (বান্দার) আমল উপস্থাপন করা হয় এর অর্থ বা উদ্দেশ্য কী? এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) প্রতিদিনই আল্লাহর দরবারে বান্দার আমল উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার সাপ্তাহিক আমল উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর শা‘বান মাসে বাৎসরিক আমল উপস্থাপন করা হয়। (২) দিনের আমল দিনেই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক আমল সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়। অথবা এর বিপরীতে প্রতিদিনের আমল প্রতিদিনই সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর বিস্তারিতভাবে সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক আমলের রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ- আমি পছন্দ করি যে, সিয়ামরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট আমার আমল উপস্থাপিত হোক। কেননা সিয়াম এমন একটি আমল যা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। আর প্রত্যেকেই তার প্রিয়জনের নিকট তার ভালো রিপোর্ট যাক তাই কামনা করে। এজন্যই আল্লাহর রাসূল পছন্দ করতেন যে, তার সিয়ামরত অবস্থায় রিপোর্ট যেন আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়।

হাদীসের শিক্ষা :

(১) সিয়াম আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল।

(২) প্রতিমাসেই সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব।

(৩) সামর্থ্য থাকলে রমাযান মাস ছাড়াও পূর্ণমাস সিয়াম পালন করা বৈধ।

(৪) অন্যান্য মাসের তুলনায় শা‘বান মাসের আলাদা বৈশিষ্ট্য তথা মর্যাদা রয়েছে।

(৫) শা‘বান মাসে আল্লাহর নিকট বান্দার বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করা হয়।

(৬) প্রিয়জনের নিকট ভালো কাজের রিপোর্ট পেশ হওয়টাই কাম্য।

(৭) শা‘বান মাসের যে কোনো অংশেই সিয়াম পালন করা বৈধ।

(৮) মাকরূহ সময়েও অভ্যাসগত সিয়াম পালন করা মাকরূহ নহে।

(৯) অভ্যাসগত সিয়াম ব্যতীত রামাযানের পূর্ব মূহূর্তে সিয়াম পালন না করাই মুস্তাহাব।

(১০) সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ করা উচিৎ।

(১১) শা‘বান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করার মাধ্যমে আগত রমাযান মাসের সম্মান প্রদর্শন বাঞ্ছণীয়।

* * *

সহীহ তা‘লীমুল কুরআন ও হিফয বিভাগ

তা‘লীমুল কুরআন (নূরানী) শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা‘লীমী বোর্ড- **তা‘লীমুল কুরআন (নূরানী) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৩-** এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগামী ২৫ মার্চ ২০২৩ হতে ১৩ এপ্রিল ২০২৩ **(২রা রামাযান হতে ২০ রামাযান ১৪৪৪ হিজরী)** পর্যন্ত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, যাত্রাবাড়ী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশা-আল্লাহ। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হলো।

শর্তসমূহ:

১. আগামী ০৮ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে- ৪,০০০/- (চার হাজার টাকা) ফি প্রদান পূর্বক রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
২. প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীকে অবশ্যই সার্বক্ষণিক নির্ধারিত ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে হবে।
৩. প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় হবে।
৪. প্রশিক্ষণার্থীকে প্রয়োজনীয় বিছানা ও আসবাব-পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

সুবিধাসমূহ:

১. অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকমন্ডলী দ্বারা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
২. প্রশিক্ষণ শেষে বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।
৩. প্রশিক্ষণে ভালো ফলাফল আর্জনকারীদের চাকুরির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করা হবে।

বিঃ দ্রঃ আসন সংখ্যা সীমিত

(ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা‘লীমী বোর্ড
৭৯/ক/০৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
যোগাযোগ:
মোবাইল: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৯, ০১৬১১-৪৯৫৪৭৪,
০১৭৪৪-৬৩২৯৮৮, বিকাশ পার্সোনাল : ০১৯৮৮-৯৩৬৪৭৪

সম্পাদকীয় الافتتاحية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন ২০২৩ সফল হোক

আল-হামদুলিল্লাহ! আগামী ৯ ও ১০ মার্চ ২০২৩ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইলে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানা, মডেল মাদরাসা ও প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি ময়দানে জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আহলে হাদীস সমাজের দুই দিনব্যাপী সর্ববৃহৎ দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন। ইন শা আল্লাহ এবারের মহাসম্মেলন আয়োজনকারীদের প্রত্যাশা, দেশি-বিদেশী মেহমানের অংশগ্রহণ হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক। যাঁদের মধ্যে সউদী আরব, কাতার, কুয়েত, মিসর, ভারত, পাকিস্তান ও নেপালসহ অনেক দেশের উলামা-মাশায়েখ অংশ নেবেন। উপস্থিতির সংখ্যা লক্ষাধিক আশা করা হচ্ছে। মাহে রমাযানের পূর্বমুহূর্তে এ মহাসম্মেলনের প্রতি সারা দেশে একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, প্রায় সারাদেশ থেকে প্রতিটি জেলায় জেলায় এ মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ আলোচনা শোনার, শেখার আগ্রহ মানুষের মধ্যে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ শিরক থেকে বাঁচতে ও বিদ‘আতমুক্ত ইবাদত করার লক্ষ্যে আহলে হাদীসের যে কোনো সম্মেলনে দলে দলে ছুটছেন। এবারের জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেলা সম্মেলনগুলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিরক-বিদ‘আতের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিমদেরকে তাওহীদের দীক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি) রংপুর জেলার হারাগাছের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের (কনফারেন্সের) মাধ্যমে যে দাওয়াত ও তাবলীগী মিশন শুরু করেছিলেন; তারই ধারাবাহিকতা আজো চলমান রয়েছে। হারাগাছের পর পাবনার বাঁশবাজার হয়ে রাজধানীর পল্টনের কনফারেন্সের স্মৃতি এখনো অনেকে স্মরণ করেন। পুরান ঢাকার বংশাল নতুন চৌরাস্তায় পাকিস্তানের আল্লামা ইহসান এলাহী জহীর (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি)-এর সেদিনের বক্তব্য ঢাকাবাসী এখনো মনে করেন। এবারের মহাসম্মেলনে সেই আল্লামা ইহসান এলাহী জহিরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে, অল ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আল্লামা আসগর মাদানীর উপস্থিত হওয়ার। আল-হামদুলিল্লাহ।

নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত, শিরকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ এবং কুরআন সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে তাবলীগী কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। জমঈয়ত ১৯৪৬ সন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, মহাসম্মেলন, কনফারেন্স, আলোচনা সভা আয়োজন করে দীনের দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করছে। শিক্ষামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতা ঐতিহ্যগতভাবে অব্যাহত রেখেছে। এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা, দিক-নির্দেশনা ও জাতীয় সংহতির আহবায়ক সাপ্তাহিক আরাফাত নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে চলছে। পাশাপাশি আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি)-এর কুরআন হাদীস গবেষণাপত্র মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক, মাসআলা-মাসায়েল গ্রন্থ, প্রশ্নোত্তরবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করে জমঈয়ত প্রকাশনা জগতে অবদান রাখছে। জমঈয়তের এহেন উদার কর্মকাণ্ডে দেশের অধিকাংশ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা অব্যাহত রয়েছে। সে কারণে জমঈয়ত আয়োজিত মহাসম্মেলনের প্রতি সর্বস্তরের জনসাধারণের তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সূচনালগ্ন থেকে আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি)-এর আদর্শ লালন করে আহলুল হাদীসের সামাজিক সর্ববৃহৎ ঐক্যের লক্ষ্যে মহাসম্মেলনে সম্প্রীতির আহবান জানানো হয়েছে। রমাযানের পূর্বমুহূর্তে তাই এ মহাসম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজন। আমরা আশা করব সকল দ্বীনী ভাইয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মহাসম্মেলনকে স্বার্থক করে তুলবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন ॥ ❑❒

সালাফী আকীদাহ বনাম অন্যান্য আকীদাহ

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী★

(১ম পর্ব)

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে আকীদাহ বলা হয়। এ বিশ্বাসটা সঠিকও হতে পারে আবার বাতিলও হতে পারে। বিশ্বাসটা যদি কুরআন ও সুন্নাহর দলীল মোতাবেক হয় এবং তা বাস্তবের সাথে হুবহু মিলে যায়, তাহলে সেটা হয় সহীহ আকীদাহ বা সঠিক বিশ্বাস। আর অন্তরের বিশ্বাসটি যদি কুরআন ও সহীহ হাদীছের দলীল এবং বাস্তবের সাথে না মিলে, তাহলে সেটা হয় বাতিল আকীদাহ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর পরিভাষায় পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর সহীহ সুন্নাতে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং গায়েব সম্পর্কে যেসব সংবাদ এসেছে, সেসব বিষয়ের প্রতি সালাফদের বুঝ ও বিশ্বাস মোতাবেক অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাসকে সহীহ আকীদাহ বলা হয়। এখানে সালাফ বলতে সহাবী, তাবেঈ ও তাবউত তাবেঈগণ উদ্দেশ্য। আর সালাফদের যুগের পরে আগমনকারী যেসব মুসলিম সালাফদের পথে চলে তাদেরকে সালাফদের আকীদাহর প্রতি সম্বন্ধ করে সালাফী বলা হয়। কুরআন ও সহীহ সুন্নাতে আল্লাহ তা‘আলা, তার নাম ও গুণাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে যা কিছু এসেছে, সেসব বিষয়ে সাহাবীদের বুঝটাই ছিল সঠিক। কারণ, তারা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিল, তাদের ভাষাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তারা রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ দ্বীনের যাবতীয় বিষয় অর্জন করে তারা উভয় জগতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

‘যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহাসফলতা’।[১৪]

সাহাবীগণ রাসূল ﷺ থেকে শিখেছেন, তারা হুবহু সেভাবেই তাদের পরের যুগের মুসলিমদেরকে শিখিয়েছেন। অতঃপর সালাফদের যুগ পার হওয়ার পর সাহাবীদের পথ বাদ দিয়ে অনেক ফির্কার আবির্ভাব ঘটেছে। এ উম্মতের সর্বপ্রথম যে বিদ‘আত ও কুফুরী আকীদাহ বের হয়েছে, তা হচ্ছে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের বিদ‘আত। তারাই সর্বপ্রথম তাকদীর অস্বীকার করেছে। অতঃপর শিয়া, মুরজীয়া, জাবরিয়া ফির্কার আবির্ভাব ঘটে।

এসব বাতিল ফির্কা থেকেই পরবর্তীতে আরো অনেক ফির্কার আবির্ভাব ঘটে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও ছড়িয়ে রয়েছে অনেক বাতিল ফির্কা। ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব বাতিল ফির্কা বিদ্যমান, তার মধ্যে ব্রেলবী ফির্কা অন্যতম। নিম্নে আমরা এ ভ্রান্ত ফির্কার কিছু আকীদাহ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

ব্রেলবীদেরকে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলি জেলার প্রতি সম্বন্ধ করে বেরেলবী বলা হয়। তাদেরকে রেজাখানীও বলা হয়। কারণ তাদের আকীদাহ ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশে ১৮৬৫ সালে জন্মগ্রহণকারী আহমদ রেজা খান। আমাদের দেশে তারা রেজভী নামেও পরিচিত। তাই তার নামের প্রতি সম্বন্ধ করে তার অনুসারীদেরকে রেজাখানী বলা হয়।

রেজাখানীদের কিছু ভ্রান্ত আকীদা ও তার প্রতিবাদ :

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানার আকীদাহ রাখা :

সালাফী আকীদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইলমুল গাইব অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অবগত আছেন। তাঁর জন্য অদৃশ্য বলতে

★ *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।*

[১৪] *সূরা আত্-তাওবা আয়াত : ১০০*

কিছুই নেই। দৃশ্য-অদৃশ্যের পার্থক্য মাখলুকের জন্য। আল্লাহ সমানভাবে আলিমুল গাইব এবং আলিমুশ শাহাদাহ। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ্য। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অদৃশ্য-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত'।[১৫] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের জ্ঞান, যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না'।[১৬] অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

'বলো, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউই গায়েব জানে না'।[১৭] অনুরূপ নবী ﷺ বলেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া আর তা কেউ জানে না। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন"।[১৮] অনুরূপভাবে এতদসংক্রান্ত আরো বহু হাদীস রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ গায়েব জানতেন না; যদিও তিনি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলদের নেতা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্যরা তো মোটেই জানার কথা নয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও এ জ্ঞানের কিছুই জানতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে কিছু জানাতেন।

এ জন্যই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র ওপর অপবাদ দেওয়ার বিষয় নিয়ে লোকেরা যখন বলাবলি করছিল তখন তিনি অহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র পবিত্রতার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো এক সফরে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র হার হারিয়ে গেলে তিনি বেশ কয়েকজনকে সেটার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সেটা কোথায় আছে সেটা জানতে পারেননি, অবশেষে যখন উট দাঁড় করানো হলো তখন তারা হারটিকে উটের নিচে দেখতে পেল। নবী ﷺ যে গায়েব জানতেন না, সে ব্যাপারে তিরমিযী শরীফে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ»

তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি সে বিষয়ে কথা বলবে সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যারোপ করল। (১) যে বলবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ মিরাজের রাতে বা অন্য সময় তার নিজ চোখে আল্লাহকে দেখেছেন, সে আল্লাহর ওপর বিরাট মিথ্যারোপ করল। (২) যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কিতাবের কিছু অংশ গোপন করেছেন, সে আল্লাহর ওপর বিরাট মিথ্যা রটনা করল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে রাসূল! পৌছে দাও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না করো, তবে তুমি তার পয়গাম কিছুই পৌছালে না।[১৯] (৩) আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে. মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (গায়েবের) আগাম খবর দিতে পারতেন সেও আল্লাহর ওপর চরম মিথ্যা রটনা করল।[২০]

সহীহ বুখারীতে রাবী বিনতে মুআব্বিয রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূল ﷺ তার বাড়িতে গিয়ে বসলেন। তখন আনসারী মেয়েরা দফ বাজিয়ে বদরের

---

[১৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২৫৫*
[১৬] *সূরা আল-আন' আম আয়াত : ৫৯*
[১৭] *সূরা আন-নামল আয়াত : ৬৫*
[১৮] *সূরা লুকমান আয়াত : ৩৪*
[১৯] *সূরা আল-মায়িদা আয়াত : ৬৭*
[২০] *তিরমিযী হা : ৩০৬৮ সহীহ*

যুদ্ধে তাদের নিহত পিতাদের বীরত্বগাঁথা গাইতেছিল। তখন একটি মেয়ে বলে ফেললো,

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ»

অর্থাৎ আমাদের মাঝে আছেন এমন একজন নবী, যিনি আগামীকালের খবর জানেন। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা বলা বাদ দাও। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব কথা বলছিলে তা বলতে থাকো।[২১]

তবে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের বহু জ্ঞান দান করেছেন। আর নবীগণের মধ্যে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাকাম এ বিষয়ে সকলের উর্ধ্বে। আল্লাহ পাক তাঁকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন সমষ্টিগতভাবে অন্য কোনো রাসূলকেও তা দান করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ব্যতীত।[২২] কিন্তু এরপরও একথা বলার অবকাশ নেই যে, রাসূল ﷺ আলিমুল গাইব ছিলেন বা ভবিষ্যতে যা হবে ও অতীতে যা হয়েছে সকল বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর সামনে যা ঘটত তা যেমন তিনি জানতেন, দূরের-কাছের অন্য সবকিছুই জানতেন; যা ওহী আসত তা যেমন জানতেন, যা ওহী হত না তাও তেমনি জানতেন!! কারণ, এ তো হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর বিশেষ সিফাতের মধ্যে শরীক করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। কেননা কুরআনে কারীম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই গুণবাচক নাম। তেমনি অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক কিছু আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে জানাননি। কারণ, ঐসব বিষয় তার নবুওত ও রেসালাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। যেমন কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো আয়াত বা সূরা তাঁর কাছে ওহীরূপে আসার পূর্বে তা তাঁর জানা ছিল না। উল্লেখিত সহীহ আকীদার ওপর একটি-দুটি নয়, চল্লিশটির মতো আয়াত কারীমা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপরোক্ত সহীহ আকীদার পক্ষে শত শত হাদীস রয়েছে। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে উম্মাতের সালাফ ও ইমামদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের বিভিন্ন বাতিল ও ভ্রান্ত ফির্কার মধ্যে উল্লেখিত সহীহ আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদাহ রয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন ফির্কা, তরীকা ও দলের মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। আমাদের দেশের একটি ফির্কা হচ্ছে বেরলবী ফির্কা। বেরলভীদের আকীদা হচ্ছে- দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুর ইলম রাসূল ﷺ-কে দেয়া হয়েছে। একই সাথে অতীতে যা কিছু হয়েছে ও কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সব বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন! সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাত জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সামান্যতম বিষয়ও তার জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল না। উক্ত বাতিল আকীদা প্রচারের জন্য স্বয়ং আহমদ রেযা খান একাধিক বই লিখেছে।

২. হাযির-নাযির শীর্ষক আকীদাহ :

পরিভাষায় হাযির-নাযির ঐ সত্তাকে বলে যার শক্তি ও জ্ঞান সর্বাবস্থায় সকল স্থানকে বেষ্টন করে আছে। কোনো কিছু তাঁর ইলম ও কুদরতের বাইরে নয়। তিনি সকল কিছু দেখেন। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না। এমন সত্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বদ্রষ্টা। তিনি স্বীয় সত্তায় সর্বত্র বিদ্যমান নন; তিনি সমস্ত সৃষ্টির ওপরে আরশের ওপর সমুন্নত। এটি অতি সুস্পষ্ট ও অকাট্য এবং কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে উল্লেখিত অর্থে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হাযির-নাযির (সবস্থানে বিরাজমান ও সর্বদ্রষ্টা) মনে করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও শিরকী আকীদাহ। এ আকীদার ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতা বোঝার জন্য দেখা যেতে পারে তারা শুধু রাসূল ﷺ-কেই নয়, বুযুর্গানে দ্বীনকেও হাযির-নাযির মানে। বেরলভদের সুপ্রসদ্ধি আলেম আহমদ ইয়ার খান বলেন, জগতে হাযির-নাযির থাকার শরয়ী অর্থ হচ্ছে, পবিত্র শরীরের অধিকারী কোনো সত্তা একই স্থানে অবস্থান করে সমস্ত দুনিয়াকে নিজের হাতের তালুর মত দেখেন। দূরের ও কাছের সমস্ত

---

[২১] *সহীহ বুখারী হা : ৪০০১*

[২২] *সূরা জিন আয়াত : ২৬*

আওয়ায শোনেন। আবার মুহূর্তের মাঝে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন। শত শত মাইল দূর থেকে অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করেন। এ ভ্রমণ শুধু রুহানীভাবে হোক অথবা মিছালী দেহের সাথে, অথবা এমন দেহের সাথে যা কোনো কবরে সমাহিত বা কোনো স্থানে মওজুদ।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনেক দলীল দ্বারা ব্রেলবীদের এই ভ্রান্ত আকীদাহটি প্রত্যাখ্যাত। নিম্নে কিছু দলীল উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত। একথা কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপরে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন'। আল্লাহ তা'আলা সূরা রা'দের ২ নং আয়াতে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

'আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে। তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের ওপরে সমুন্নত হয়েছেন'। আল্লাহ তা'আলা সূরা ত্ব-হা'র ৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ 'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন'। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরক্বানের ৫৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾

'তিনিই ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপরে সমুন্নত হয়েছেন, তিনি পরম দয়াময়'। আল্লাহ তা'আলা সূরা সাজদার ৫৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

'আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন'। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

'আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে ওঠে, তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। আর তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহ প্রত্যক্ষ করেন'।

৩. মোখতারে কুল শীর্ষক আকীদাহ :

ইসলামের সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত একটি আকীদাহ হচ্ছে, সৃষ্টিজগতের সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন। এর পক্ষে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদী ছাড়াও অনেক আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু বেরলভী জামাতের আকীদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা রাসূল ﷺ-কে মোখতারে কুল বা সবকিছুর মালিক মনে করে। আহমদ রেযা খান লিখেছেন, হুযুর সকল প্রকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। দুনিয়া-আখিরাতের সকল ভাণ্ডার ও নি'আমতের খাযানা হুযুরের কব্জায় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দিবেন যাকে ইচ্ছা দিবেন না। সমস্ত ফায়সালা কার্যকর হয়

একমাত্র হুযুরের দরবার থেকেই। আর যে কেউ যখনই কোনো নি'আমত কোনো দৌলত পায় তা পায় হুযুরের রাজ-ফরমান থেকেই।[২৩]

আহমদ রেযা খান সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য কুরআনে কারীমের আয়াতের সাথে মেলালেই একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না যে, এগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا () قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا () قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا () إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾

বলে দাও, আমি তো কেবল আমার রবের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বলুন, আমি মালিক নই তোমাদের ক্ষতি সাধনের আর না সুপথে আনয়নের। বলে দাও, আল্লাহ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আর আমিও তাকে ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।[২৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴾

বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ।[২৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

'বলুন, আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মালিক নই; কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে প্রচুর ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে নিতাম এবং কোনো কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা- যারা আমার কথা মানে তাদের জন্য।[২৬]

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

'তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীগণকে।[২৭] এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে।

৪. বিদ'আতের অভিনব সংজ্ঞা :

অসংখ্য কুফুরী ও শিরকী আকীদাহর পাশাপাশি তারা বিদ'আতের সংজ্ঞার তাহরীফ ও বিকৃতি সাধন করেছে। এ বিকৃতি সাধনের কারণে বেরলভী জামাতের আলেমগণ বিদ'আত ও কুসংস্কারের পক্ষের দলে পরিণত হয়েছেন। খায়রুল কুরুন তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের সোনালী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিদ'আতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, শরঈ দলীল-প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়টি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রমাণিত নয় এমন কিছুকে দ্বীনের হুকুম মনে করে করার নামই বিদ'আত। বিষয়টি আকাইদ সংক্রান্ত হোক বা ইবাদত সংক্রান্ত, অথবা ইবাদতের সময় ও পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক, কিংবা তা হোক দ্বীনের অন্য কোনো শাখার সাথে সম্পৃক্ত হোক। (দ্র. আল-ই'তিসাম, শাতেবী; আল মাদখাল, ইবনুল হাজ্জ; মেরকাত, মোল্লা আলী কারী; রাহে সুন্নাত, সরফরায খান; মুতালাআয়ে বেরলভিয়্যাত, খালেদ মাহমুদ; ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী)

কিন্তু আহমদ রেযা খান ও তার সহযোগী মৌলভীরা এ সংজ্ঞা এভাবে বিকৃত করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আকীদা, ইবাদাত অথবা ইবাদতের বিশেষ কোনো পদ্ধতি নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন বিষয়কে দ্বীনের হুকুম সাব্যস্ত করতে অসুবিধা নেই এবং এটাকে বিদ'আত বলারও অবকাশ নেই। (চলবে ইনশা আল্লাহ)

---

[২৩] *আহমদ রেযা খান, ৪/৭০-৭১*
[২৪] *সূরা জিন আয়াত : ২০-২৩*
[২৫] *সূরা আল-আন'আম আয়াত : ৫০*
[২৬] *সূরা আল-আরাফ আয়াত : ১৮৮*
[২৭] *সূরা আল-কাসাস আয়াত : ৫৬*

দা‘ওয়াতুন নাবাবী শর্ত ও সতর্কতা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব ❄

(১ম পর্ব)

নাবী ﷺ যে দা‘ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন এবং যে আদর্শের মাধ্যমে দা‘ওয়াহ দিয়েছেন, সহজভাবে বললে সেটাই দা‘ওয়াতুন নাবাবী বা নবুওয়াতী দা‘ওয়াহ বা আল্লাহ প্রদত্ত দা‘ওয়াত ও তাবলীগ।

সকল সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবিঈন ও তাবিউত তাবিঈনগণসহ আইম্মায়ে কিরাম রাসূল ﷺ এর রেখে যাওয়া আদর্শের ওপর থেকেই দীনের দা‘ওয়াহ দিয়েছেন। পর্ববর্তীকালে দীনের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা, যথাক্রমে : শী‘আ, রাফেজী, মু’তাযিলা, মুরযিয়া, মুশাব্বিহা, কারামতিয়া, কালাবিয়া, জাবারিয়া ও খারিজীসহ অসংখ্য ফেরকার উদ্ভব হলে দীনের নামে ভ্রান্ত পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং দা‘ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আদর্শচ্যুতি ঘটে যায়। অর্থাৎ, দীনের দাওয়াহর ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর আদর্শ পরিত্যাগ করে বিভিন্ন ফেরকা ও গোষ্ঠিগত আবিষ্কৃত আদর্শ ও পদ্ধতিকে দীনি দা‘ওয়াহর একমাত্র সত্য ও সঠিক আদর্শ হিসাবে গণ্য করা হয়। যা বর্তমানকাল পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে বিশ্ব দরবারে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছে। এর কারণ, দীনের সঠিকত্বটা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ফেরকা ও গোষ্ঠিগত বুঝ ও আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং দা‘ওয়াহর ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর আদর্শ নয় বরং ফেরকা ও গোষ্ঠিগত আদর্শটাই চূড়ান্ত। যেখানে দা‘ওয়াত ও তাবলীগের আবশ্যকীয় যেসব শর্ত রয়েছে তা যেন দীনের কোনো বিষয়ই নয়। আর ইখলাস ! সে তো যেন অপরাধিরূপে পালিয়ে বেড়ায়, মানবহৃদয়ে ঠাঁই পাওয়া যেন তার জন্য বড্ড কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলাফল স্বরূপ ইসলামের শত্রুরা যেন আমাদের কাঁধে বসে মাথার ওপর কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে আর খাওয়া শেষে আমাদেরই মাথার ওপর নিমর্মভাবে আঘাত করছে।

এহেন অবস্থা সত্য দীনের সঠিক দা‘ওয়াতের দুর্বার গতি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

দীনের দা‘ওয়াতকে গতিময় ও বিশ্ব দরবারে ইসলামের সৌন্দর্যকে সঠিভাবে উপস্থাপন করতে হলে অবশ্যই দা‘ওয়াহর শর্তগুলোকে শক্তভাবে মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা দা‘ওয়াহর কতিপয় শর্ত নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি এবং ক্রমাগতভাবে তা উপস্থাপন করবো ইন শা আল্লাহ।

প্রথম শর্ত : الاخلاص। ইখলাস : ইখলাস এমন একটি বিষয় যা শুধু দা‘ওয়াহর ক্ষেত্রে নয় বরং সকল কর্মক্ষেত্রেই এর আবশ্যকতা রয়েছে। আর দা‘ওয়াহ যেহেতু দীন প্রচার ও প্রসারের প্রধানতম মাধ্যম সেহেতু দা‘ওয়াহর ক্ষেত্রে ইখলাসটা আরো বেশি প্রয়োজন ও অপরিহার্য। ইখলাস ছাড়া দা‘ওয়াহ ও তাবলীগের প্রচার ও প্রসার স্থায়ী লাভ করবে না।

ইখলাস হলো, কোনো কিছু একনিষ্ঠভাবে করা ও পছন্দনীয় করে তোলা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন :

أَهْلُ الْإِخْلَاصِ لِلْمَعْبُودِ وَالْمُتَابَعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ " {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} حَقِيقَةً، فَأَعْمَالُهُمْ كُلُّهَا لِلَّهِ، وَأَقْوَالُهُمْ لِلَّهِ، وَعَطَاؤُهُمْ لِلَّهِ، وَمَنْعُهُمْ لِلَّهِ، وَحُبُّهُمْ لِلَّهِ، وَبُغْضُهُمْ لِلَّهِ، فَمُعَامَلَتُهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَحْدَهُ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مِنَ النَّاسِ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وَلَا ابْتِغَاءَ الْجَاهِ عِنْدَهُمْ.

এবাদত ও আনুগত্যের বিষয়ে ইখলাসসম্পন্ন তো তারাই যারা ইয়্যাকা না’বুদু-এর অধিকারী। (অর্থাৎ যারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার এবাদতে প্রতিশ্রুতিশীল তারাই প্রকৃত ইখলাসের অধিকারী)

তাদের সমস্ত আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাদের সকল কথা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাদের দান-সাদকাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাদের বঞ্চিত করা একমাত্র

❄ মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

আল্লাহর জন্য, তাদের ভালোবাসা ও ক্রোধ একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পারস্পারিক লেন-দেন একমাত্র আল্লাহর জন্য। তারা এসব কিছুর বিনিময়ে মানুষের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতার আশা করে না এবং তাদের কাছে কোনো সম্মান ও মর্যাদাও অনুসন্ধান করে না।[২৮]

আর যে একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাস ও স্বীকার করে তাকে মুখলিস বলা হয়। আর এজন্যই সূরা ইখলাসকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে মর্মে অনেক বিদ্যানগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনুল আছির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : সূরা ইখলাসকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার গুণাবলী ও পবিত্রতা একনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করেছে, অথবা এ সূরা পাঠকারী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ বর্ণনা করে। ইখলাসের বাক্যটাই তো তাওহীদের বাক্য।[২৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে তো এছাড়া অন্য কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার এবাদত করবে খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন।[৩০]

উমার বিন খাত্তাব রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন : নিশ্চয় সকল কর্মের প্রাপ্য নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। যে উদ্দেশ্যে নিয়্যাত করবে সে তাই পাবে। যে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে। অতএব, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করবে তার হিজরতটা সে উদ্দেশ্যেই বলে গণ্য হবে।[৩১]

আলোচ্য আয়াত ও হাদীস সৎ আমলে ইখলাস আনয়নের প্রধান ও স্পষ্ট দলীল। ইখলাসবিহীন কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আবু উমামা আল-বাহিলী রযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ»

যে আমলে ইখলাস বা একনিষ্ঠতা নেই এবং যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয় না, এমন কোনো আমলই আল্লাহ তা‘আলা কবুল করেন না।[৩২]

দীনের পথে মানুষকে আহ্বান করা একটি বড় ও অতীব মর্যাদাসম্পন্ন সৎ আমল যা আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং দীনের দা‘ওয়াহ থেকে যখন ইখলাস উঠে যাবে তখন দা‘ওয়াত ও তাবলীগ দীন থেকে বিচ্যুত হবে। এর ফলে সারা জীবন দীনের দা‘ওয়াহ দিয়ে বড় দাঈ’র সুখ্যাতি অর্জিত হলেও আল্লাহ তা‘আলার কাছে তা খড়কুটার মতোই অতি তুচ্ছ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَأَحْسَنَ إِلَى النَّاسِ فَهَذَا قَائِمٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحَقِّ عِبَادِ اللَّهِ فِي إِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ. وَمَنْ طَلَبَ مِنْ الْعِبَادِ الْعِوَضَ ثَنَاءً أَوْ دُعَاءً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْسِنًا إِلَيْهِمْ لِلَّهِ.

যে আল্লাহ তা‘আলার এবাদত করে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে এটা তার জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও তার বান্দার হক আদায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়। আর যে ব্যক্তি বান্দাদের কাছে তার বিনিময়-প্রশংসা

---

[২৮] *মাদারিজুস সালিকীন- ২/১০৪ পৃ.*

[২৯] *লিসানুল আরাব- ৭/২৬ পৃ :*

[৩০] *সূরা আল-বায়্যিনাহ আয়াত : ০৫*

[৩১] *সহীহ বুখারী হা : ১*

[৩২] *নাসাঈ হা : ৩১৪০ সনদ সহীহ*

দু‘আ বা অন্য কিছু চায় সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হতে পারবে না।[৩৩]

সুতরাং দা‘ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে ঘণ্টাপ্রতি বাজেট করে বিনিময় গ্রহণ করা, সুখ্যাতি অর্জন করা বা অন্য কিছুর প্রতি লোভী হওয়া মোটেই দা‘ওয়াহর ক্ষেত্রে সুবিচার নয় বরং অবশ্যই তা লৌকিকতার শামিল। তাই তো নাবী ﷺ বলেছেন :

ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ.

তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিমের অন্তর যেন প্রতারিত না হয়। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর জন্য কাজ করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং তাদের সঙ্গে জামা‘আতবদ্ধ থাকা।[৩৪]

দ্বিতীয় শর্ত : الهدف বা লক্ষ্যস্থির করা : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করার ওপর দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহর সফলতা পুরোপুরিভাবেই নির্ভরশীল। আরবী **الهدف** (আল হাদ্‌ফ) এর শাব্দিক অর্থ হলো : প্রত্যেক সুউচ্চ বৃহৎ কোনো বস্তু।

ইবনু সীদাহ রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন : প্রত্যেক লম্বা দেহ ও উঁচু গর্দানধারী ব্যক্তি বা তৎসাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুকে **الهدف** (হাদ্‌ফ) বলা হয়। অন্য অর্থে সুনির্দিষ্ট ও বলিষ্ঠ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হাদ্‌ফ বলা হয়।[৩৫]

ইবনুল আসীর রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন : প্রত্যেক উচ্চ ও মজবুত ভিত্তিকে **الهدف** (আল হাদ্‌ফ) বলা হয়।[৩৬]

সুতরাং দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহর মজবুত ভিত্তি হলো সুনির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা। অবশ্য উল্লেখিত শব্দটি নাবী ﷺ-এর বাণীতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন : আব্দুল্লাহ বিন জাফর রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ»

নাবী ﷺ তার প্রয়োজন পূর্ণ (পায়খানা) করার জন্য উঁচু টিলা অথবা খেজুর বাগানের আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন।[৩৭]

ইবনু আব্বাস রযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

«لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا، فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا أي هدفا.

তোমরা জীবনধারী কোনো প্রাণীকে নিশানা বা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না।[৩৮]

মোট কথা **الهدف** শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকলেও সবগুলো অর্থই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর সাথে সমাঞ্জপূর্ণ, মোটেও বৈপরিত্যপূর্ণ নয়।

সুতরাং এখানে **الهدف** (আল হাদ্‌ফ) শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দা‘ওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা। আর তিনটি বিষয় ব্যতীত দা‘ওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গতা পাবে না, এমনকি সঠিক ও বাস্তবসম্মতও হবে না। উক্ত তিনটি বিষয় হলো :

(১) التوحيد তথা আল্লাহর একত্ববাদ

(২) নাবী ﷺ-এর অনুগত্য এবং সাহাবীগণের রযিয়াল্লা-হু ‘আনহুম মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

(৩) تزكية النفس বা আত্মশুদ্ধি।

এ তিনটি বিষয় ব্যতীত কোনো মতেই দীনি দা‘ওয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

কিন্তু বড্ড পরিতাপের বিষয় হলো- বর্তমান সময়ের আলোচিত কথিত দাঈ কিংবা বক্তাগণ দা‘ওয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া অধিকাংশ সংগঠন যারা নিজেদের শতভাগ সঠিক বলতে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু দা‘ওয়াহর মূল লক্ষ্য হতে তারা শতভাগ বিচ্যুত।

আমরা দা‘ওয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা ও পর্যালোচনা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করবো ইন শা আল্লাহ। (চলবে ইন শা আল্লাহ)

---

[৩৩] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১/৪৫ পৃ.
[৩৪] মুসনাদ আহমাদ হা : ১৬৭৫৪, ইবনু মাজাহ হা : ২৩১
[৩৫] লিসানুল আরাব : ৯/৩৪৬ পৃ.
[৩৬] গারীবুল হাদীস- ৫/২৫১
[৩৭] সহীহ মুসলিম হা : ৩৪২, ইবনু মাজাহ হা : ৩৪০
[৩৮] ইবনু মাজাহ হা : ৩১৮৭

মুক্তিপ্রাপ্ত দল : প্রকৃতি, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ[❉]

(পর্ব-১)

মানুষের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত; মহাকালের তুলনায় বড়ই নগণ্য। দয়াময় আল্লাহ দুনিয়াকে পরকালের কর্মক্ষেত্র হিসেবে একটি সুযোগ হিসেবে দান করেছেন। দুনিয়ায় মানুষের কাজের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ পরকালে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। পরকালে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত লাভ করাই চূড়ান্ত মুক্তি। আর সেই মুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যেকের উচিত পবিত্র আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা। আল-কুরআন ও হাদীসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ থাকলেও মুসলমানগণ বিভিন্ন সময় আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। আর সকল দলই নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল দাবি করেছে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে। এসব মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের জেনে নেয়া উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম বলেননি। বরং তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ ﷺ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ مُسْتَقِيْمًا، وَخَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيْلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ قوله تعالى وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে একটা দাগ টানলেন, অতঃপর বললেন, 'এটা আল্লাহ তা'আলার সোজা ও সঠিক রাস্তা। অতঃপর তাঁর ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এগুলো অন্য রাস্তা যাদের প্রত্যেকটার শুরুতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর আল্লাহর বাণী পড়লেন, 'এটাই আমার সোজা ও সঠিক রাস্তা। সুতরাং তোমরা অবশ্যই এর অনুসরণ করবে এবং অন্যা রাস্তাসমূহের অনুসরণ করো না, তাহলে এ রাস্তাসমূহ তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি এভাবেই তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার'।[৩৯] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুক্তির জন্য একটি সঠিক রাস্তা ছাড়াও শয়তানের তৈরি বিভিন্ন ভ্রান্ত রাস্তা থাকবে। অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মাতে মুহাম্মাদীর বিভক্তির কথা উল্লেখ করে মুক্তিপ্রাপ্তদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَتَهْلِكُ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ، قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَة.

'নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭০ দল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং একটি দল নাজাত পেয়েছে। আর আমার উম্মত অচিরেই ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ৭১ দল ধ্বংস হবে (জাহান্নামে যাবে) এবং একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। সাহাবীগণ বললেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা একটি দল, তারা একটি দল'।[৪০] অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوْا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَة.

'ওহে, অবশ্যই তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ও নাসারা) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই এ

[❉] *সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সহকারী অধ্যাপক : আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।*

[৩৯] *সূরা আল-আনআম আয়াত : ১৫৩, আহমাদ হা : ৪১৪২, নাসাঈ কুবরা হা : ১১১৭৪, হাকেম হা : ৩২৪১, মিশকাত ১/৫৯*

[৪০] *মুসনাদে আহমাদ হা : ২৫০১, সিলসিলা সহীহাহ হা : ২০৪, সনদ হাসান।*

উম্মত অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামী ও একদল জান্নাতী। (জান্নাতীরা হল) একটি জামা'আত বা দল'।[৪১] উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুসলমানদের মধ্যেই ৭২/৭৩টি দল হবে। তন্মধ্যে ৭১/৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। সেটিই মূলত মুক্তিপ্রাপ্ত দল। অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ হক্বপন্থী দল প্রসঙ্গে বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

'আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধীরা বা পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে'।[৪২] বর্তমানে সকল নামধারী ইসলামী দলই এসব হাদীসকে উল্লেখ করে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বলার চেষ্টা করে। আর বিরোধী দলকে পথভ্রষ্ট ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রচার করে। আসলে মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? রাসূল ﷺ স্বীয় সাহাবীদের সম্মুখে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের কথা বর্ণনা করলে তারা রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? রাসূল ﷺ সাহাবীদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, সে সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

(১) রাসূল ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন, **هى الجماعة،** 'এটা হল একটা দল'।[৪৩] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি। তাই এই অস্পষ্টতাকে পুঁজি করে অনেক দলই বলে থাকে, এখানে যেহেতু জামা'আতের কথা বলা হয়েছে সেহেতু জামা'আত যত বড় হবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অধিকারী। দলীল হিসাবে একটি যঈফ হাদীস পেশ করে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবি কর'।[৪৪] ইবনু মাজাহতে আনাস রযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক এ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসটিও যঈফ।[৪৫] জামা'আতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নয়। মূলতঃ জামা'আতের জন্য লোক বেশি হওয়া শর্ত নয়, হক্বের অনুসারী হওয়া শর্ত। জামা'আতের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন,

الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك.

'জামা'আত হচ্ছে হক্বের অনুগামী হওয়া, যদিও তুমি একাকী হও'।[৪৬] যেমন আল্লাহ ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে একটি দল বলেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّٰهِ حَنِيْفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী একটি উম্মত বিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।[৪৭] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-কে أمة বা জাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যদিও তিনি ছিলেন একা। এখানে আল্লাহ সংখ্যাধিক্যের দৃষ্টিতে নয়; বরং হক্বের ওপরে থাকার কারণে ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর প্রশংসা করেছেন। পক্ষান্তরে সংখ্যায় বেশি হলেও সেখানে কুরআন ও হাদীস মোতাবেক আমল না থাকলে সেটা হক্বপন্থী ও নাজাতপ্রাপ্ত দল নয়।

বড় দল হক্বের মানদণ্ড নয়

অনেক সময় কোনো দলে লোকসংখ্যা বেশি দেখে মানুষ মনে করে ঐ দলের লোকেরাই হক্বের পথে আছে। তাদের ধারণা এত লোক মিলে কি ভুল পথে যেতে পারে? আবার অনেকে বলেও থাকেন, দশজন যেখানে আল্লাহও সেখানে। এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ হক্বপন্থী হওয়ার জন্য সংখ্যায় বেশি হওয়া শর্ত নয়, বরং বাতিলের সংখ্যা হক্বপন্থীদের তুলনায় বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। যেমন রাসূল ﷺ হক্ব দল ১টি এবং বাতিল দল ৭২টি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হক্বপন্থীদের সংখ্যা কম হবে, এটাই রসূলের ভাষ্য। সাধারণভাবে কোনো দলে লোক বেশি থাকাই বাতিল হওয়ার প্রমাণ। কারণ রাসূল ﷺ-এর উম্মাতের ৭৩টি দলের মধ্যে ৭২টি দলই জাহান্নামে যাবে। সুতরাং বাতিলদের সংখ্যা বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সঠিক দলটি খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর মানুষ সাধারণত এ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না; বড় দল ও সংখ্যা বেশি দেখে তাদের

---

[৪১] *আহমাদ হা : ১৬৯৭৯, ইবনু মাজাহ হা : ৩৯৯২, মিশকাত হা : ১৭২*
[৪২] *সহীহ বুখারী হা : ৩৯৯২, সহীহ মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায় হা : ১৯২০*
[৪৩] *মিশকাত হা : ১৭২, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
[৪৪] *হাদীসটি যঈফ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা : ১৭৪-এর টিকা 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ*
[৪৫] *যঈফ, ইবনু মাজাহ হা : ৭৮৮, সিলসিলা যঈফা হা : ২৮৯৬*
[৪৬] *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃ. সনদ সহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা : ১৭৩, ১/৬১ পৃ.*
[৪৭] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ১২০*

অনুসরণ করে। এজন্য দিন দিন বাতিলের সংখ্যা বাড়ছেই। আমরা যদি পৃথিবীর জনসংখ্যার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান। যদি সংখ্যা হক্বপন্থী হওয়ার শর্ত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে বিধর্মীরাই হক্বের ওপর আছে। অথচ তা কোনো মুসলিম স্বীকার করবে না, মেনেও নেবে না। হক্ব-বাতিলের মানদণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সংখ্যার দ্বারা নির্ধারণ করেননি; বরং নিঃশর্তভাবে অহির অনুসরণ করাই হল হক্বপন্থী হওয়ার জন্য শর্ত।

অপরদিকে মহান আল্লাহ কুরআনে যেসব স্থানে -اكثرهم। اكثر-كثيرة-كثيراً-كثير শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন, প্রায় সব জায়গায় বলেছেন, অধিকাংশরাই মূর্খ, কাফের, ফাসেক, গাফেল ইত্যাদি। যেমন আল্লাহর বাণী, أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ‘তাদের অধিকাংশই জানে না’।[৪৮] অন্য আয়াতে আছে, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ‘তাদের অধিকাংশই ফাসিক’।[৪৯] অন্য আয়াতে আছে, وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُوْنَ ‘নিশ্চয়ই অধিকাংশ মানুষ আমার আয়াত সম্পর্কে গাফেল’।[৫০] এছাড়া বেশি সংখ্যক লোকদের অবস্থা কী হবে তাও আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْن﴾

‘আর আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা তারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফেল’।[৫১] অপরদিকে আল্লাহ তা‘আলা কম সংখ্যক লোকদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ‘আমার বান্দাদের মধ্যে কম সংখ্যকই শোকরগুজার’।[৫২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ‘তোমরা অল্প সংখ্যক লোকই শুকরিয়া আদায় কর’।[৫৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ ‘তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর’।[৫৪] রাসূল ﷺও অল্প সংখ্যক লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আবূবকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

‘ইসলাম শুরু হয়েছিল গুটিকতক লোকের মাধ্যমে, আবার সেই অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য’।[৫৫] আর এই অল্প সংখ্যক হক্বপন্থী লোকদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাদেরকে নিশ্চিহ্নও করতে পারবে না। তারা সংখ্যায় কম হলেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইন শা আল্লাহ।

(২) রাসূল ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় প্রসঙ্গে অন্য হাদীছে বলেন, ما انا عليه وأصحابى ‘(মুক্তিপ্রাপ্ত দল) হচ্ছে আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথের ওপর আছি’।[৫৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

‘আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন, ‘যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত’।[৫৭] এ হাদীসেও রাসূল ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো দলের নাম বলেননি; বরং বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ কোনো দলের নাম বললে সবাই সেই দলের অনুসারী বলে দাবি করত। এজন্য রাসূল ﷺ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যাতে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপরে আমল করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর উদ্দীষ্ট দল তৈরি হয়। ***(দ্বিতীয় পর্ব আগামী সংখ্যায় যাবে ইনশা আল্লাহ)***

---

[৪৮] *আল-কুরআন, ৬ :৩৭; ৭ : ১৩১; ৮ : ৩৪; ১০ : ৫৫; ১৬ : ৭৫, ১০১; ২৭ : ৬১; ৮ : ১৩, ৫৭; ২৯ : ৬৩; ৪৪ : ৩৯; ৪৯ : ৪; ৫*

[৪৯] *আল-কুরআন, ৫৭ : ১৬, ২৬, ২৭; ৫ : ৮১*

[৫০] *সূরা ইউনুস আয়াত : ৯২*

[৫১] *সূরা আল-আরাফ আয়াত : ১৭৯*

[৫২] *সূরা আস্-সাবা আয়াত : ১৩*

[৫৩] *সূরা আল-আরাফ আয়াত : ১০*

[৫৪] *সূরা আল-হাক্কাহ আয়াত : ৪১, সূরা আল-আরাফ আয়াত : ৩*

[৫৫] *মুসলিম হা : ১৪৫; মিশকাত হা : ১৫৯ ‘কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।*

[৫৬] *সুনানে তিরমিযী, হা : ২১২৯; সিলসিলা সহীহাহ হা : ১৩৪৮; হাকেম ১/১২৯; আহমাদ বিন হাম্বল, সুন্নাতের মূলনীতি, বাংলায় ইসলাম, (ইংল্যান্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২), পৃঃ ২৪*

[৫৭] *তিরমিযী হা : ২৬৪১; মিশকাত হা : ১৭১*

অজানা ইতিহাস

আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী ❁

অজানা ইতিহাস- ১ : জামেআতু আযহার প্রতিষ্ঠার পেছনে লুকায়িত যা ছিল- মিশরের জামেআতু আযহার তথা আল- আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা বিকাশে অনেক অবদান রয়েছে কিন্তু অনেকেই জানে না এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে লুকায়িত কী রহস্য ছিল? ইনশা আল্লাহ সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করবো।

শী'আ উবাইদুল্লাহ মাহদী সে মুলত মাইমুনা বিন কাদ্দাহ ইহুদি বংশধরের সন্তান-নিজেকে ফাতেমি বংশের সন্তান বলে প্রচার চালিয়ে দেয়া ছিল তার একটি কৌশলমাত্র ।

উবাইদুল্লাহ মাহদী তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ২৯৫ হিজরীতে উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত 'কায়রোয়ান' নগরীতে হামলা চালিয়ে পুরা নগরী ধ্বংস করে, এমনকি বীভৎস ধ্বংসলীলার মাঝে ৩০ হাজারেরও বেশি সুন্নি মুসলমানকে হত্যা করে। একই বছরে 'ফাস' নগরীতে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

তার কুখ্যাত সন্তান আল-মুইজ লিদ্বীনিল্লাহ ৩৫৯ হিজরীতে মিশর জবরদখল করে শত শত সুন্নি ওলামাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আশ্চর্যের বিষয় হল এই উবাইদী শী'আদের - আমাদের দেশে মহান ইসলামী শাসক হিসেবে পরিচিত করে তোলা হয়, অথচ তারা দ্বীন থেকে বহির্ভূত নিকৃষ্ট ফেরাক 'ইসমাইলী শী'আ' ছিল।

আমি যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ডিপার্টমেন্টে পড়তাম- তখন ম্যাডাম সাহেবা ফাতেমি রাজবংশের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে করুণ কান্নায় ভেঙে পড়েন, কিন্তু আজ সঠিক ইতিহাস জানতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আলহামদু লিল্লাহ।

মুইজ লিদ্বীনিল্লাহ -জামেআতু আজহার প্রতিষ্ঠা করেন তাদের শী'আ মতবাদ প্রচার প্রসারের জন্য। জামেআতু আজাহারে মূল উদ্দেশ্যই ছিল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে নির্মূল করা, সুন্নিদের মূলোৎপাটন করা এবং অতি কৌশলে মিশরের মাটিতে শী'আ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। কায়রো শহরও -মুইজ প্রতিষ্ঠা করেন এই জন্য তাকে বলা হয় 'কাহেরাতুল মুইজ' মূলত মুইজের ষড়যন্ত্র-কৌশল ছিল সুন্নি মুসলিম নিধন করা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, শী'আদের প্রতিষ্ঠিত জামেআতু আজহার ও কায়রো নগরী নিয়ে কিছু মুসলিম ঐতিহাসিক গর্ভবোধ করে তাদের মুসলমানদের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি বলে আখ্যায়িত করেন।

কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিক কখনো চিন্তা করেনি যে, তাদের এ প্রতিষ্ঠার পেছনে কী-রকম জঘন্যতম উদ্দেশ্য ছিল -যাদের আকিদাই ছিল মুসলিম নিধন করা, তাদের আবার এইসব স্থপতি মুসলমানদের অন্যতম কীর্তি বলার সুযোগ কোথায়?

প্রথমত তারা মুসলমানই নয়, পরবর্তীতে দেখুন কত ভয়ানক ইতিহাস- তারা এর মাধ্যমেই সুন্নিদের ধ্বংস করেছে, শী'আ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে।

শী'আ উবাইদীরা ৩৫৯ হিজরীতে ফিলিস্তিন জবরদখল করে সেখানে অসংখ্য সুন্নি আলেমকে হত্যা করে, তাদের এই নিষ্ঠুরতা ১০৪ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এই উবায়দী শী'আরা কিছু মসজিদ - মাদ্রাসা নির্মাণ করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণের কাছে ভালোবাসা পাওয়া, বিপরীতে তাদেরকে শী'আ বানানো।

তাদের নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম একটি ঘটনা হলো ফিলিস্তিনের আসকালিন নগরী দখল- অতঃপর সেখানে একটি কথিত মাজারকে তারা জনসাধারণকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, এটা হোসাইনের মস্তকের মাজার, সেখান থেকে হোসাইনের মাথা নেওয়ার দাবি করে মিসরে নিয়ে এসে তারা সমাধি তৈরি করে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, বর্তমানে যা মিশরের খান-ই খলিল এর নিকটে অবস্থিত।

❁ *পিএইচডি, গবেষক ইতিহাস বিভাগ, কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব।*

অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখনো কিছু অজ্ঞ মিশরবাসি সেখানে পূজা করে চলছে, এটি ছিল উবাইদী শী'আ গোষ্ঠীর অন্যতম এক সফলতা।

৩৮৬ হিজরিতে মিশরের মাটিতে উবাইদী শী'আ গোষ্ঠীরা হাকিম বি আমরিল্লা নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব ঘটায়। এ ব্যক্তি এতটাই কুখ্যাত রক্তপিপাসু ও নিষ্ঠুর ছিল যে, সে নিজেকে প্রভু বলে দাবি করে বসে। তার নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে কায়রোবাসী মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কায়রো নগরী আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়।

তার এই জঘন্যতম নির্দেশনা অনুযায়ী আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে পুরা কায়রো নগরী পুড়ে ভস্মীভূত করা হয়। এতে হাজার হাজার নরনারী শিশু আগুনে পুড়ে মারা যায়।

এমনকি যে সৈনিক আগুন লাগিয়েছিল তাকে যখন বলা হলো কায়রো নগরীর কী অবস্থা? উত্তরে বলল, এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, রোমদেরকে যদি ফ্রিতে এই নগরী তুলে দেওয়া হয় তারপরেও তারা সেটি গ্রহণ করবে না। এতে নরপশু 'হাকিম' অপমাণ বোধ করে সেই সৈনিককে হত্যা করে।

তার অনুসারীরা এই বলে তাকে সম্বোধন করতো

ما شئت لا ما شاء الأقدار - فاحكم فأنت الواحد القهار.

অর্থাৎ তাকদীর তো কিছুই না।

তাই হয়- যা আপনি চান, তাই শাসন করুন ইচ্ছামত, আপনি তো একক ও মহাশক্তিমান। [নাউজু বিল্লাহ]

পরিশেষে বলতে চাই

কিছু ভাই শী'আদের প্রশংসায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন, তাদের ইসলামের কর্ণধার মনে করেন, অথচ ইসলাম নিধনে তাদের ভূমিকা এড়িয়ে যান, আল্লাহ হেদায়েত দান করুন।

অজানা ইতিহাস- ২ : রক্তাক্ত জনপদ- রক্তে বীভৎস আল কুদ্স!!

সেই ৩৫৯ হিজরি থেকে উবাইদী শী'আ গোষ্ঠী একটানা ১০৪ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিনে তথা আল কুদস নগরীতে সুন্নি মুসলমানদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন অব্যাহত রাখে। সুন্নি মুসলমানদের হত্যা এবং গুম করা ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ।

মূলত ৩৩৪ হিজরি থেকেই মুসলিম বিশ্বে শী'আদের জয়জয়কার। প্রায় ১০০ বছর তাদের তাণ্ডব পুরা মুসলিম বিশ্বে অব্যাহত থাকে।

উবাইদী শী'আরা শাম, মিশরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, বুহাইয়ী শী'আরা ৩৩৪ হিজরিতে বাগদাদ ও আশেপাশে অঞ্চলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, হিজাজের দক্ষিণ অঞ্চলে কেরামতি শী'আ গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে, ইয়ামানে যায়দিয়া শী'আ শাসন করে, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানে ১২ ইমামে বিশ্বাসীরা কর্তৃত্ব লাভ করে, ফলে চতুর্দিকে শিরক বিদ'আতের ভয়াল রূপ জেগে উঠে।

আল্লাহর মেহেরবানীতে অভিশপ্ত এ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য আবির্ভূত হন সেলজুক সুলতান তগরুল বেগা তিনি ছিলেন বিখ্যাত বীর- মুজাহিদ।

তিনিই সর্বপ্রথম ইরাকের মাটি থেকে বুহাইয়ী শী'আদের উৎখাত করেন।

এরপর ফিলিস্তিনের মাটি থেকে উবায়দী শী'আদের উৎখাতের জন্য আরেক সেলজুক সুলতান বীর মুজাহিদ, মুত্তাকী রোম সাম্রাজ্যবাদীর উৎখাতকারী, মহান সমরবিদ ধীশক্তিসম্পন্ন উলাব্বা আরসানা (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) নাপাক শী'আদের থেকে আলকুদুস উদ্ধারের জন্য তার সেনাপতি আতসিজ ইবনে উয়াক খাওয়ারিজমিকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেন।

সেনাপতি আতসিজ ৪৬৩ হিজরিতে ফিলিস্তিনের মাটি থেকে শী'আদের বের করে দেন। এরপর ৪৬৩ থেকে ৪৮৯ হিজরি তথা ২৭ বছর ফিলিস্তিন-বাইতুল মাকদিস শী'আমুক্ত থাকে।

অতঃপর ৪৮৯ হিজরিতে আবার শী'আ গোষ্ঠী ফিলিস্তিন দখল করে নেয়।

সুন্নি আলেমদের নির্মমভাবে হত্যা করতে থাকে, অসংখ্য আলেমকে ঘরছাড়া করে, এরপর তারা ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের হাতে ফিলিস্তিন তুলে দিয়ে চলে যায়, যাতে করে সকল সুন্নি মুসলিমদের খ্রিস্টানরা হত্যা করতে পারে। *(বাকী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সরল-পথের সন্ধান

ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ[❄]

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। ইবাদাতের এ মহাদায়িত্ব পালনে কে কতটুকু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়- তা পরীক্ষা করতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ ধরাধামে পাঠিয়েছেন। দয়া ও রহমতের আধার আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং, মানুষ যাতে তার দায়িত্ব পালনে সফল হতে পারে- সেজন্য তাকে পদে পদে সাহায্য করেছেন।

সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ মানুষের মাঝে স্রষ্টার বিশ্বাস ঢেলে দিয়েছেন। এরপরও শয়তান ও প্রবৃত্তির ধোকায় পড়ে মানুষ যখনই বিপথে পা বাড়িয়েছে, তখনই তাদের সঠিক পথ দেখাতে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল।

প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তা'আলা দুটি জিনিস দিয়ে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন- ১. দীন ২. শরী'আহ।

প্রত্যেক নাবীর মূল স্লোগান ছিল একটি, সেটি হল 'তাওহীদ'। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক।[৫৮]

তাওহীদের এ আহ্বান মেনে নেওয়ার নামই ইসলাম যারা তা মেনে নেয় তাদের বলা হয় মুসলিম। আর ইসলামই হল একমাত্র দীন বা জীবন-বিধান যেটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।[৫৯]

নাবীদের দেওয়া দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শারী'আহ। তাওহীদ বা ইসলামকে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়ার বাস্তবতা প্রমাণ করতে, প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির উপযোগী একটি শারী'আহ দান করেছিলেন। তাই প্রতিটি জাতিই পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শারী'আহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি যাতে তোমাদেরকে যে শরী'আহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন।[৬০]

সর্বশেষ পূর্বের সকল শারী'আহ বাতিল করে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য একটি পরিপূর্ণ ও উপযোগী শারী'আহ দান করেন।

আল্লাহ তা'আলার দেওয়া এ বিষয় দুটিকে যারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে এবং বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করবে তাদের জন্যেই রয়েছে পরম সফলতা। আর যারা একে অবহেলা বা অমান্য করবে, তাদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ।

তাওহীদ ও শরী'আহ অনুসরণে মানুষের ভিন্নতা রয়েছে। এ দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. খাঁটি মুসলমান।

তারা দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে পালন করে এবং কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। তারা আল্লাহ তা'আলার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। আর আল্লাহ'র দ্বীনের নির্দেশনা মুতাবেক দলিল প্রমাণসহ সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আলহামদু লিল্লাহ, তারা সংখ্যায় অল্প হলেও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। তারা ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও বিশুদ্ধ আকিদার বন্ধনে জড়িয়ে আছে। এদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ তাঁর হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.

[❄] মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ, চট্টগ্রাম।
দাওরায়ে হাদিস : মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

[৫৮] সূরা আন-নাহল আয়াত : ৩৬

[৫৯] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৯

[৬০] সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত : ৪৮

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকবে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর নির্দেশ তথা কিয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকবে।[৬১]

তাই, হে ভাই! ইসলাম ও ঈমানের ধনে ধন্য হয়ে পার্থিব ও পরজগতে সফল হতে চাইলে এ দলের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করুন। সুমিষ্ট সবুজ (পৃথিবী)-র পেছনে ছুটে এ-নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে পড়ে। রবের সেই বাণী স্মরণ আছে কী? আল্লাহ বলেন :

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।[৬২]

দুই. এমন মানুষ যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে কিন্তু, বিকৃতি ও বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে। অথবা কুফুরি কিংবা অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীতে এদের সংখ্যাই বেশি। এরা হল ইসলামের দাবিদার সুফি, শী'আ, বাতেনী, নুসাইরিয়্যাহ ও কবরপুজারী সম্প্রদায়। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্র, বাথিজম, জাতিয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মত নানাবিধ ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীরাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করলেও বিকৃত কর্মবিশ্বাসে লিপ্ত রয়েছে।

তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রয়োজন আকিদার জ্ঞানে সজ্জিত হওয়া এবং এ সকল মতবাদের আহ্বানকারী থেকে সতর্ক থাকা; কারণ, এরা হল জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো অকল্যাণের আহ্বায়ক। তাদের কাছে রয়েছে চিত্তাকর্ষক ধোকার উপকরণ, যা ওই শ্রেণীর মুসলিম যুবকদের জন্য খুবই ভয়াবহ- যারা বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার বর্মে সজ্জিত নয়।

তিন. ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী।

তারা আবার দু-ধরনের। একদল হল আহলে কিতাব- যারা এমন ধর্মের অনুসরণ করে যা মৌলিকভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হলেও পরবর্তীতে তাতে বিকৃতি ও শিরক ঢুকে পড়েছে এবং পরিশেষে সেটি রহিত হয়ে গেছে। এরা হল ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান।

আরেকদল হল পৌত্তলিক- যারা এমন বানোয়াট ধর্মের অনুসরণ করে, যার মূলভিত্তিই হল শিরক, মূর্তিপূজা ও সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করা। যেমন : (হিন্দু) ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান, মূর্তিপূজক ও অধিকাংশ দার্শনিক।

এ দলের লোকেরা স্পষ্ট কাফের। মুসলিমদের দায়িত্ব হল এদের সাথে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কে না-জড়ানো। কারণ, এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী।

চার. নাস্তিক।

যারা কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না, বা এমন মতের অনুসরণ করে- যা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এরা হল কতিপয় দার্শনিক, বস্তুবাদী, কমিউনিস্ট, কতক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও এ ধরনের মতবাদে যারা বিশ্বাসী।

এরা সুস্পষ্ট কাফের ও নাস্তিক। মুসলমানদের কর্তব্য হল এদেরকে বর্জন করা এবং তাদের সাথে শত্রুভাবাপন্ন থাকা। সুতরাং, মুসলিমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়বে না। বরং, তাদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবে।

হে মুসলিম ভাই! সরল পথের সন্ধানী হোন। আপনার দ্বীন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন, আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন। চারপাশে কী ঘটছে, আপনার দ্বীন ও জাতির ব্যাপারে কী ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে- সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। যেন আপনি ভালোটি জেনে তা আঁকড়ে ধরতে পারেন এবং খারাপটি জেনে তা পরিত্যাগ করতে পারেন। আপনাকে হতে হবে আপনার ধর্ম, বিশ্বাস ও জাতির একনিষ্ঠ সৈনিক, যারা সরল পথে চলতে চলতে রবের সান্নিধ্যে উপস্থিত হবেন।❑❑

---

[৬১] *সহীহ মুসলিম হা : ১৯২০*

[৬২] *সূরা আল-কাহফ আয়াত : ২৮*

কেন আমি এই
কোয়ান্টাম মেথড ত্যাগ করলাম

শেখ আহসান উদ্দিন[*]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। দরূদ ও সালাম মহানবী ﷺ ও তার পরিবারের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন/ধর্ম'।[৬৩]

মহানবী ﷺ বলেন 'দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরলে কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। সেই দুটি জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ।'

কোয়ান্টাম মেথড/কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমাদের বাংলাদেশের একটি অন্যতম সংস্থা। তবে এটি একটি বিতর্কিত দল/সংস্থা। এ প্রতিষ্ঠানের নাম আমি ২০১৫ বা ২০১৬ সালে যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন শুনেছিলাম। হাসপাতাল, দোকান, ফার্মেসীসহ অনেক জায়গায় 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' এমন সুন্দর ও চটকদার কথার স্টিকার দেখলাম, সেগুলো কোয়ান্টাম মেথডের স্টিকার। দেশের প্রতি জেলায় জেলায় এদের কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি প্রবাসে অন্যান্য দেশেও এদের শাখা রয়েছে।

এ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আগে নাম ছিল যোগ ফাউন্ডেশন। এ কোয়ান্টাম মেথড তারা মূলত মেডিটেশন/ধ্যানকে প্রমোট করে। এরা একটি এনজিও সংস্থাও বটে। এ কোয়ান্টাম মেথড ১৯৯৩ সালে বোখারি মহাজাতক ওরফে শহীদুল শিকদার নামে এক জ্যোতিষী টাইপের লোক প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, এ লোক তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাক'সহ কয়েকটা পত্রিকায় ধ্যান, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখত। তবে বাংলাদেশের অনেক আলেম উলামায়ে কেরাম অভিযোগ করেন যে, এই শহীদ বোখারি মহাজাতক মেডিটেশনের আড়ালে ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার করছে। এই কোয়ান্টাম মেথড থেকে 'কোয়ান্টাম কণিকা', 'অটোসাজেশন', আল-কুরআন বাংলা মর্মবাণী', 'হাজারো প্রশ্নের জবাব', 'মনছবি উচ্ছাস'সহ তাদের অনেক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং তারা 'অটোসাজেশন কণিকা', 'কুরআন কণিকা (১-৪)', 'হে মানুষ শোনো (বিদায় হজের ভাষণ', 'হাদিস কণিকা', 'রমাদান কণিকা'সহ অনেক কণিকা/বুকলেট প্রকাশ করেছে। তারা বিধর্মীদের জন্য বেদ-গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক ধম্মপদ কণিকা প্রকাশ করেছিল। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় তাদের প্রকাশনা রয়েছে। কিন্তু তাদের অন্যতম কাজ হলো মেডিটেশন।

তাদের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি, মেডিটেশন ও প্রোগ্রাম রয়েছে। কোয়ান্টাম মেথডে প্রতিবছর তিন/চার দিন ১০ ঘণ্টা মেডিটেশন কোর্স করানো হয়। সারাদেশে তাদের কার্যক্রম লক্ষ্যণীয়। যারা কোয়ান্টাম মেথডের প্রোগ্রামে গিয়েছেন সেসব ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। বরং বিরোধটা কোয়ান্টামের কতিপয় বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের সাথে। ঢাকার শান্তিনগর অথবা কাকরাইলে তাদের হেডকোয়ার্টার। প্রতি শুক্রবার তাদের 'সাদাকায়ন' (মেডিটেশন ও বক্তব্য) কর্মসূচি হয়। তাদের মাটির ব্যাংক ও যাকাত ফান্ড আছে। ইন্টারনেটে তাদের মতবাদের প্রচার লক্ষ্যণীয়। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং এন্ড্রয়েড মোবাইলে প্লে-স্টোরে তাদের অ্যাপস রয়েছে।

আমি প্রথম কোয়ান্টামিদের প্রোগ্রামে যাওয়া শুরু করি ২০১৭ সালের মে মাসে। তাদের 'সাদাকায়ন, প্রোগ্রামে কোয়ান্টামের পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার শাখায় যেতাম। সেখানে দেখি একপাশে পুরুষ অপর পাশে মহিলাদের বসার জায়গা। সেখানে পুরুষ মহিলা একত্রে প্রোগ্রাম করে। রমযান মাসে তাদের প্রকাশিত আল কুরআন বাংলা মর্মবাণী পড়তাম। তারা বলে এটা অনুবাদ নয় বরং তা ভাবানুবাদ বা মর্মবাণী। এদের প্রকাশিত আল কুরআন বাংলা মর্মবাণীর ব্যাপারেও অনেক আপত্তিকর অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। বলা চলে, ২০১৭ এর এপ্রিল থেকে ২০১৮-এর আগস্ট এ দেড় বছর কোয়ান্টামিদের মেডিটেশন করতাম ও তাদের প্রোগ্রামের যেতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে গত ২০১৯ এ SSC পরীক্ষার পরবর্তী ছুটিকালীন সময়ে তাদের প্রোগ্রামে যাওয়া, মেডিটেশন করা এবং তাদের বইপুস্তক

---

[*] *শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় বিআইইউ, ঢাকা।*

[৬৩] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৯*

বুলেটিন পড়া বন্ধ করলাম ধর্মীয় ও পারিবারিক দিক বিবেচনা করে। তাদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে এলাম। কারণ তাদের মতাদর্শ মূলত ফিতনা হয়ে গেছে। তারা বাহ্যিকভাবে একরকম কিন্তু আড়ালে অন্যকিছু। তারা বাহ্যিকভাবে মেডিটেশন ও মানবসেবার কাজ করলেও তারা মূলত সম্রাট আকবরের ভ্রান্ত দ্বীনে ইলাহির অনুসরণ, ইলুমিনাতি ও অন্যান্য অনেক ভ্রান্ত মতবাদ প্রমোট করছে। তাদের আল-কুরআন বাংলা মর্মবাণী এটিতে অনেক ভুল ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লেখা আছে। যদিও এর প্রকাশক দাবি করেন ‘তিনি ৮টি অনুবাদ ও তাফসীরের আলোকে করেছেন। সেগুলো হলো, মর্মাডিউক পিকথলি, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, মুহাম্মদ আসাদ, মাও. আশরাফ আলী থানভী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মুফতি মুহাম্মদ শফী, আল্লামা শাব্বীর উসমানি ও মাও. আব্দুর রহিমের অনুবাদ ও তাফসীরের সহায়তা নিয়েছেন। ‘এখানে এ আটজনের অনুবাদ ও তাফসীরের কারো একে অপরের মিল নাই। যে কারণে এ শহিদ বোখারী মহাজাতকের কোয়ান্টামিদের ফাঁদ খপ্পর থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পেরেছে। বিদ‘আতী, কাদিয়ানী, খ্রিস্টান মিশনারী, হেজবুত তাওহীদের মতো এ কোয়ান্টাম মেথডও ভ্রান্ত দল।

এখানে কোয়ান্টামিদের ১৫টি ভ্রান্ত মতাদর্শ ও তার খণ্ডন দেওয়া হলো :

১. এটি তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং পরিষ্কারভাবে শিরক। তাওহীদ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ কেন্দ্রিক। ইসলামের সকল ইবাদতের লক্ষ্য হল আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (সা :)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও পরকালে মুক্তিলাভ করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনার লক্ষ্য হল অন্তরগুরুকে পাওয়া। যা আল্লাহ থেকে সরিয়ে মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করে। এদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেন, ‘আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে? আপনি কি তার যিম্মাদার হবেন’? ‘আপনি কি ভেবেছেন ওদের অধিকাংশ শুনে বা বুঝে? ওরা তো পশুর মতো বা তার চাইতে পথভ্রষ্ট’।[৬৪] মূলতঃ ঐ অন্তরগুরুটা হল শয়তান। সে সর্বদা তাকে রঙিন স্বপ্নের মাধ্যমে তার দিকে প্রলুব্ধ করে।

২. তাদের দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য (তাদের প্রকাশিত বই ‘হাজারো প্রশ্নের জবাব, কোয়ান্টাম বুলেটিনসমূহ ও কোয়ান্টাম উচ্ছাস) লা হাওলা ওয়াল কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অথচ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেন’, নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম’।[৬৫]

৩. তারা বলেন, কোয়ান্টাম মেডিটেশনের জন্য ধর্মবিশ্বাস কোনো জরুরি বিষয় নয়। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। তাদের কার্যাবলীতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, ‘এখন কোয়ান্টাম শিশু কাননে রয়েছে ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর চার শতাধিক শিশু। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রামা, খ্রিষ্টান, প্রকৃতিপূজারী সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে। আর এক সাথে গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসাবে’ (শিশু কানন)।

জবাব : মানুষকে সকল ধর্ম থেকে বের করে এনে কোয়ান্টামের নতুন ধর্মে দীক্ষা নেবার ও কোয়ান্টাম নেতাদের গোলাম বানানোর চমৎকার যুক্তি এগুলো। কেননা অন্তরগুরুর ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে গেলে একজন আলোকিত গুরুর কাছে বায়আত বা দীক্ষা নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আধ্যাত্মিকতার সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যেকোনো সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন’।[৬৬] অর্থাৎ এরা ‘আলোকিত মানুষ’ বানাচ্ছে না। বরং ইসলামের আলো থেকে বের করে এক অজানা অন্ধকারে বন্দি করছে। যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করবে, তা কবুল করা হবে না। ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[৬৭] রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি’।[৬৮] অতএব, ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরাই কেবল আলোকিত মানুষ। বাকি সবাই অন্ধকারের অধিবাসী।

---

[৬৪] *সূরা আল-ফুরক্বান আয়াত : ৪৩-৪৪*

[৬৫] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৯*

[৬৬] *টেক্সট বুক, পৃ : ২৪৭*

[৬৭] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৮৫*

[৬৮] *আহমাদ মিশকাত হা : ১৭৭*

৪. তারা বলে, বহু আলেম আমাদের মেডিটেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এর সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই বলেছেন।

জবাব : অল্প জ্ঞানী অথবা কপট বিশ্বাসী ও দুনিয়াপূজারী লোকই চিরকাল ইসলামের ক্ষতি করেছে। আজও করছে। ওমর রযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি বস্তু : (১) আলেমদের পদস্খলন (২) আল্লাহর কিতাবে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন' (দারেমী)। মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব, যা তাঁর ও তাঁর সাহাবিগণের আমলে দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল, কেবলমাত্র সেটাই দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে। তার বাইরে কোনো কিছুই দ্বীন নয়।

৫. মেডিটেশন পদ্ধতি নিজের উপরে তাওয়াক্কুল করতে বলে এবং শিখানো হয় যে, 'তুমি চাইলেই সব করতে পার'। এরা হাতে মূল্যবান 'কোয়ান্টাম বালা' পরে ও তার ওপরে ভরসা করে।

জবাব : ইসলাম মানুষকে মহাশক্তিধর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে শিখায় এবং আল্লাহ যা চান তাই হয়। এর মাধ্যমে মুমিন নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করে ও পূর্ণ আত্মশক্তি ফিরে পায়। আর ইসলামে এ ধরনের 'বালা' পরা জায়েজ নাই

৬. তারা বলেন, শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন এক ক্ষমতা তৈরি হয়, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারে। এজন্য একটা গল্প বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সে ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। তারপর সেখানে ভাল একটা চাকরির জন্য মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সেখানে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই উন্নতমানের একটা চাকরি পেয়ে গেল'।[৬৯]

জবাব : ইসলাম মানুষকে তাকদীরে বিশ্বাস রেখে বৈধভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বলে। অথচ কোয়ান্টাম সেখানে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথিত মনছবির পূজা করতে বলে।

৭. কোয়ান্টাম মেথড এর মেডিটেশনে বহুল ব্যবহৃত ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড মিউজিকটা (ইউটিউবে এবং https ://meditation.quantummethod.org.bd/bn/meditation-list/meditation লিংকে তাদের এসব মেডিটেশন আছে) একটা বিদেশি প্রতিষ্ঠান এর থেকে পাইরেসি করে চুরি করার অভিযোগ আছে। যা মূলত জাপানের ফুমিও মিয়াশিতা এর মিউজিক কম্পোজিশন (https ://youtu.be/MiFgvtbh43Q) থেকে চুরি করা। কোয়ান্টামিদের কল্পনা নামক গ্র্যাজুয়েট মেডিটেশন এ ব্যবহৃত ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড মিউজিকটাও আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের লঙ্ঘনে অভিযুক্ত। সেটাও বিদেশি ব্যক্তির সম্ভবত বার্মার এক বৌদ্ধ কম্পোজারের থেকে চুরি করা (https ://www.youtube.com/watch?v=k3G93i0XV34)।

৮. তাদের মেডিটেশন এর অডিওতেও অনেক ব্যানার পোস্টারে বলা থাকে 'আমার ক্ষমতা অসীম সারা পৃথিবী আমার'।

খণ্ডন : আল্লাহ তা'আলার একটা অন্যতম গুণবাচক নাম হল আল-বাকী যার অর্থ অসীম। একজন মুসলিম কখনো নিজেকে বা নিজের ক্ষমতাকে অসীম বলতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা অসীম মনে করা শিরক।

৯. তাদের মেডিটেশনে ইলুমিনাতির বা দাজ্জালের স্যালুট প্রদর্শন এর অভিযোগ রয়েছে।

১০. কোয়ান্টাম মেথডটি বিশ্ববিখ্যাত Silva Ultramind এর পদ্ধতির হুবহু নকল।

১১. কোয়ান্টামের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ বোখারী মহাজাতক ও তার স্ত্রী নাহার....উভয়েই পাসপোর্ট-এ মিথ্যা নাম ব্যবহার করেন যা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। মহাজাতকের আসল নাম শহীদুল আলম শিকদার (দুলু) ও স্ত্রী নাহারের আসল নাম আফতাবুন্নেছা। মহাজাতকের পরিবার শরীয়তপুরে স্বাধীনতাবিরোধী বংশ হিসেবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে শুরু করেন লোক ঠকানো হাত দেখা ব্যবসা। সেখানে মামলা খেয়ে শুরু করেন হালের এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

১২. এই মহাজাতক একসাথে ভাগ্যগণনার বই ও হাদিসের বই লিখে বাজারে ছেড়েছে। অথচ হাদিসে আছে 'যে ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো জ্ঞান চয়ন করলো সে জাদু টোনার একটা শাখা চয়ন করলো।[৭০]

---

[৬৯] *টেক্সট বুক পৃ. ১১৫*

[৭০] *সুনানে আবু দাউদ*

১৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না হয়েও কোয়ান্টাম সব ধর্মের ব্যাখা প্রদান করে যা পুরোপুরি হাস্যকর ও অযৌক্তিক।

১৪. মহাজাতক মেডিটেশন এক্সপার্ট নন। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে তিনি একজন এস.এস.সি পাশ ব্যক্তি।

এরূপ যোগ্যতার একজন প্রশিক্ষকের কাছ থেকে মেডিটেশন শিখে নিজে নিজে অনুশীলন করলে শারীরিক/মানসিক ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং প্রতিনিয়তই এমন হচ্ছে। কিন্তু কোয়ান্টাম এ ধরনের কোনো অভিযোগে কান না দিয়ে উল্টো অভিযোগকারীকে দোষারোপ করে থাকে এবং বার বার কোর্স রিপিটে উৎসাহ দেয়।

১৫. কোয়ান্টাম মেথড এর ওয়েবসাইটে তাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগে মৃত্যুর পরও আমরা অপচয় করি সংক্রান্ত প্রশ্ন এর জবাবে মহাজাতক বলেন 'আরবদের থেকে ইসরাইল দেশ ভালো, কারণ তারা কোটি কোটি মানুষকে ডান্ডা মেরে পিটিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছে।

খন্ডন : তার এসব বক্তব্যে সুকৌশলে দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইলের সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে সমর্থন দিচ্ছে। ইসরায়েল এর এজেন্ডা তথা জায়নবাদী এজেন্ডাকে তারা সমর্থন দিচ্ছে। আর আমরা জানি, এ দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইল তারা ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ফিলিস্তিনের মানুষদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। বাংলাদেশের একটা সংগঠন হয়ে কোয়ান্টাম এর এসব বক্তব্য খুবই জঘন্য।

তাই সাবধান হউন।

ইসলামের দৃষ্টিতে এই কোয়ান্টাম মেথড সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য বসুন্ধরা মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী প্রকাশিত 'কুরআন সুন্নাহর আলোকে কোয়ান্টাম মেথড', মাওলানা শফিউল্লাহ ফুয়াদের একজন শিক্ষক দর্শক ও দর্পণ বইয়ের ১ :১৩৯-১৪২ পৃষ্ঠা, মাওলানা মুহাম্মদ আফসারুদ্দিন রচিত' ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড 'বই, ইন্টারনেটে মাসিক আত তাহরীকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'কোয়ান্টাম মেথড একটি শয়তানী ফাঁদ', মুফতি মনসুরুল হকের দারসে মনসুর ওয়েবসাইটের প্রবন্ধ এবং ইউটিউবে ড. আবুবকর মুহাম্মদ জাকারিয়া, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি), ড. ইমাম হোসাইন- তাঁদের বয়ান আলোচনা শুনতে পারেন ।

আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন (আমিন) ❑❑

অজানা ইতিহাস

(২২ পৃষ্ঠার পর থেকে)

৪৯২ হিজরীতে ক্রুসেডার আক্রমণ শুরু করলে শী'আরা আল-কুদুস অরক্ষিত অবস্থায় রেখে মিসরে চলে যায়।

পোপ দ্বিতীয় আরবানের ঘোষণা অনুযায়ী খ্রিষ্টান ক্রুসেডার বায়তুল মাকদিসে ঢুকে মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশুদের নির্মম গণহত্যা চালাতে থাকে, বোকা মুসলমানরা মনে করেছিলো মাসজিদে থাকলে নিরাপদে থাকবে, কিন্তু কুখ্যাত ক্রুসেডাররা যখন গণহত্যায় আত্মতৃপ্তিতে ব্যস্ত, ঠিক ওপারে মিসরের মাটিতে ইহুদির রক্তে গড়া শী'আরা আনন্দে বিভোর।

নারী শিশুদের করুণ আর্তনাদ, চিৎকারে আল-কুদুস ও বায়তুল মাকদাসে এক ভয়ংকর বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মিশরে সুন্নিদের মাটিতে থাকা শী'আ গোষ্ঠী চাইলেই সাহায্য করতে পারতো- এতে হাজার হাজার মুসলিম কিছুটা হলেও রক্ষা পেত, কিন্তু ইহুদীদের রক্তে গড়া শী'আ গোষ্ঠী একবারও ফিরে দেখেনি, চোখের নিমিষেই ৭০ হাজার মুসলমানের রক্তে আল কুদুস ভেসে গেল।

কী নির্মম! কী নিষ্ঠুরতা! রক্তপিপাসু হায়েনার দল, মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম ইতিহাস রচনা করলো ইউরোপের কুখ্যাত সন্ত্রাসী ক্রুসেডাররা।

হামলায় অংশগ্রহণকারী সৈনিক রটবার্ন নিজ চোখে দেখা ধ্বংসলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : আমাদের সৈনিকরা সেদিন পুরুষ মহিলাদের জবাই করে রাস্তায় রাস্তায় ফেলে রেখেছিল, ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল, শিশুদের ধরে ধরে দ্বিখণ্ডিত করেছিল, গর্ভবতী মহিলাদের পেট কেটে বাচ্চা বের করে হত্যা করেছিল, রক্তের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, আমাদের অশ্বারোহীদের রক্তের কারণে চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ ইতিহাস জানার পরেও যারা শী'আদের ভালোবাসে, যারা শী'আদের প্রশংসামুখর তারা খাঁটি মোনাফিক ছাড়া আর কিছুই নয়। ❑❑

নারীদের সিয়াম

সাইদুর রহমান[❄]

রমাযানের আগমনের অপেক্ষায় কিছু নারী মুখিয়ে থাকেন। কীভাবে এই মহিমান্বিত মাসটির যথাযথ কদর করা যায়- এ চিন্তায় কয়েক মাস আগ থেকেই বিভোর থাকেন। হ্যাঁ, ওই সকল প্রিয় বোনের জন্যই আজকের এই লেখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ নারীরা তো (বিধানের ক্ষেত্রে) পুরুষের ন্যায়ই ।[৭১]

পুরুষরা যেমন তাদের ওপর ধার্যকৃত সিয়াম পালন করতে বাধ্য, অনুরূপ নারীরাও। কিন্তু নারীদের কিছু শারীরিক সমস্যার কারণে পুরুষদের ন্যায় গোটা মাস একাধারে সিয়াম রাখতে পারে না। অবশ্যই এতে নারীদের কোনো দোষ নেই। মহান আল্লাহই এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

হে মুমিনরা! তোমাদের পূর্বের জাতিদের ন্যায় তোমাদের ওপরও সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।[৭২]

এই আয়াতের পর্যায়ভুক্ত নারী-পুরুষ সকলে। নারীরা যখন সুস্থ থাকবে অর্থাৎ তাদের পিরিয়ডের সময় থাকবে না, তখন পুরুষদের মতো সিয়াম রাখবে। নারী-পুরুষের সিয়ামের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। সব ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান।

রমাযানে দিনের বেলা পুরুষরা যেমন অশ্লীলতা, পাপাচার, অহেতুক কথাবার্তা, কাজ, গান, বাজনা থেকে দূরে থাকবে অনুরূপ নারীরাও। তবে একটা কথা বড্ড তিক্ত মনে হলেও সত্য, রমাযানের দিনে আসরের সালাতের আগ পর্যন্ত মোটামুটি সকল নারী অবসর থাকেন। ইফতারের জোগাড় শুরু হয় আসরের পর থেকে। আসরের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টাতে কিছু নারী গীবত পরনিন্দার প্রসরা সাজিয়ে বসে। প্রিয় বোন, দেখুন আপনার সম্পর্কে আপনার নবী কী বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[৭৩]

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতদিন আপনি এই হাদিসটা জানতেন না বিধায় অপলাপ-পরনিন্দায় মজে ছিলেন। তাহলে আজ থেকে আর করবেন না।

পিরিয়ডের সময় নারীরা সিয়াম রাখবে না। রমাযান শেষ হলে সারা বছরের মাঝে যেকোনো সময় রাখতে পারবে। তবে আমরা মনে করি যত তাড়াতাড়ি করা যায়, তত তাড়াতাড়ি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। তাই উচিত যত দ্রুত করা যায়।

আয়েশা রযিয়াল্লা-হু আনহা-কে পিরিয়ডের সময় সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

(আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঋতুবতী হলে) তিনি আমাদের সিয়াম কাযার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সালাত কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।[৭৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কথাটা বলতে ইতস্তত লাগলেও বলতে হবে। কারণ সত্য উন্মোচনে স্বয়ং আল্লাহও লজ্জাবোধ করেন না।

إن الله لا يَسْتَحِي من الحقِّ .

নিশ্চয় আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না।[৭৫]

অনেক নারীর সাথে তার স্বামী রমাযানের দিনের বেলায় একটু আনন্দ উল্লাস করতে চায়। বুঝতেই তো পারছেন

[❄] *সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৭১] *আবু দাউদ হা : ২৩৬*

[৭২] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৩*

[৭৩] *সহীহ বুখারী হা : ১৯০৩*

[৭৪] *আবু দাউদ হা : ২৬৩*

[৭৫] *ইরওয়াউল গালীল হা : ২০০৫*

আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি। এক্ষেত্রে কথা হলো সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যাবে। আয়েশা ؓ বলেন,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

সিয়াম অবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খেতেন। (এ কথা বলে) 'আয়েশা ؓ হেসে দিলেন।[৭৬]

এ হাদীসে কিন্তু যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কিছু বিদ্বান পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, বৃদ্ধ হলে স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে ও জড়িয়ে ধরতে পারবে। কিন্তু যুবক হলে পারবে না। অবশ্য এর পেছনে কোনো দলিল নেই।

এখন কথা হলো, কারো যদি চুমু দেয়ার কারণে বা জড়িয়ে ধরার কারণে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে সিয়াম ভেঙে যাবে। আবার এই সিয়ামটা পরে করতে হবে। আমাদের অনেকের ধারণা ৬০টি সিয়াম করতে হবে, আদতে বিষয়টা এমন নয়। স্ত্রী সহবাস করে কেউ সিয়াম ভঙ্গ করলে এই হুকুম তার জন্য বর্তাবে। অর্থাৎ ৬০টি সিয়াম রাখতে হবে। প্রিয় বোন, দুলাভাইকে বলুন, রমাযানের রাতে আপনার সাথে যা ইচ্ছে করতে। দিনের বেলায় যেন কিছু না করে। নচেৎ সমস্যা হতে পারে।

রমাযানে কোনো নারীর বাচ্চা হলে সে সুস্থ হলে অবশিষ্ট সিয়ামগুলো রাখবে। আর যে, সিয়াম রাখতে পারেনি রমাযানের পরে তা রেখে দিবে।

গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীর যদি সিয়াম রাখতে সমস্যা না হয় তাহলে রমাযান মাসে সিয়াম রাখবে। আর যদি সমস্যা হয় তাহলে রমাযানের পরে যে কোনো মাসে সিয়াম রেখে দিবে। পরবর্তীতে যদি সিয়াম রাখতে অপারগ হয়ে যায় তাহলে ফিদিয়া দেবে। অর্থাৎ অর্ধ সা করে ৩০ জন মিসকিনকে চাউল দান করবে বা ৬০ জন মিসকীনকে খাইয়ে দিবে। আল্লাহ বলেন,

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ - আর যারা সিয়াম পালনে অপারগ তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে।[৭৭]

অসুস্থ নারী কীভাবে সিয়াম রাখবে?

অসুস্থ নারী যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রমাযানের পর সিয়াম রাখবে। আর যদি সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ফিদিয়া দিবে। আল্লাহ বলেন, وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ-আর যারা সিয়াম পালনে অপারগ তারা মিসকীনকে খাদ্য দিবে।[৭৮]

কোনো নারী যদি রমাযানে সফর করে। আর সফর করে সিয়াম রাখতে যদি তার কষ্ট না হয় তাহলে সিয়াম রাখাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ- আর সিয়াম রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[৭৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

আবুদ দারদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সফরে প্রচণ্ড গরমের দিনে আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। গরম এত প্রচণ্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই আপন আপন হাত মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন। এ সময় নবী ﷺ এবং ইবনে রাওয়াহা ؓ ব্যতীত আমাদের কেউই সিয়ামরত ছিলেন না।[৮০]

আর যদি কষ্ট হয় তাহলে সিয়াম না রাখাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

আর যে অসুস্থ বা সফরে রয়েছে, সে অন্য কোনো সময় সিয়াম রাখবে।[৮১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকের জটলা এবং ছায়ার নিচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কী হয়েছে?' লোকেরা বললো, সে সিয়াম রেখেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সফরে সিয়াম পালনে কোনো সওয়াব নেই।'[৮২]

---

[৭৬] *সহীহ বুখারী হা : ১৯২৮*

[৭৭] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৪*

[৭৮] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৪*

[৭৯] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৪*

[৮০] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৪৫*

[৮১] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫*

[৮২] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৪৬*

কোনো নারী যদি সিয়াম বাকি রেখে মারা যায় তাহলে তার পরিবার তার সিয়াম রাখবে। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

কেউ সিয়াম রেখে মারা গেলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে সিয়াম আদায় করবে।[৮৩]

আর কেউ যদি সিয়াম রাখতে না পারে তাহলে ফিদিয়া দিয়ে দিবে।

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" .

নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এক মাসের সিয়াম না রেখে মৃত্যুবরণ করে তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।[৮৪]

হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও এর ওপর ফতোয়া রয়েছে।

রমাযান মাসে নখ কাটা, বগলের নিচের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নিচের পশম কাটলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনেক নারী মনে করে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যার কারণে তারা রাতে এগুলো কাটে।

নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই সাজসজ্জা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ইসলাম একে সাপোর্ট করেছে। রমাযানে দিনের বেলা নারীরা বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে। যেমন মেহেদী দেয়া, স্নো, পাউডার, চোখে সুরমা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

নবী ﷺ নিজে রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে ইতিকাফ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীরাও ইতিকাফ করেছেন। তাই নারীরা যদি ইতিকাফ করতে চায় তাহলে করতে পারবে। তবে অবশ্যই জামে মসজিদে ইতিকাফ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তোমরা তাদের সাথে সহবাস করবে না।[৮৫] এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইতিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত করেছেন।

আয়েশা رضي الله عنها বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ .

ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, সওম না রেখে ইতিকাফ করবে না এবং জামে মাসজিদে ইতিকাফ করবে।[৮৬]

অনেক নারীকে দেখা যায় ইতিকাফ করার মাসে রমাযানের শেষ দশকে ঘরের এক কোণে নির্জন স্থানে ইতিকাফে বসে যায়। তাদের এই ইতিকাফ হবে না। কারণ ইতিকাফ করার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজিদ।

নারী যদি ইতিকাফ করে তাহলে তার স্বামী তার সাথে দেখা করতে যেতে পারবে।

নবী ﷺ-এর স্ত্রী সাফিয়া رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " . قَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا " .

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর নিকট গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (সাফিয়া رضي الله عنها

---

[৮৩] সহীহ বুখারী হা : ১৯৫২
[৮৪] ইবনু মাজাহ, দুর্বল সনদ হা : ১৭৫৭
[৮৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭
[৮৬] আবু দাউদ হা : ২৪৭৩

বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনু যায়িদ ؓ -এর ঘর (সংলগ্ন)। এ সময় আনসার গোত্রের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতু হুয়াই।, তারা দুজনে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দুজনের মনে মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে।[৮৭]

এই হাদীসে যদিও স্ত্রীর মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু স্বামীও এই হুকুমের আওতাধীন রয়েছে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত রয়েছে নারীদের ক্ষেত্রেও হুবহু একই শর্ত। অর্থাৎ সহবাস করা যাবে না, প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না, অনর্থক কথাবার্তা বলবে না।

অনেক নারীকে দেখা যায় ইতিকাফে বসে অপর নারীর সাথে বাড়ির যত্তসব কথাবার্তা আছে সবকিছু শেয়ার করে। এগুলো বলা যাবে না। কিছু নারী তো আগ বাড়িয়ে মসজিদে গীবত পরনিন্দা শুরু করে। এগুলো করলে ইতিকাফের যে হেতু আছে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ঝুড়ি কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসতে হবে।

ইতিকাফ করা অবস্থায় কোনো নারীর যদি পিরিয়ড শুরু হয় তাহলে ইতিকাফ ভঙ্গ করে মসজিদ ত্যাগ করবে। ওই অবস্থায় মসজিদে কোনো অবস্থাতেই অবস্থান করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾

হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের (মসজিদের) নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না যা বলছো, তা বুঝতে পারবে এবং অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করার আগ পর্যন্ত, তবে মুসাফির হলে ভিন্ন কথা।[৮৮]

নবী ﷺ বলেছেন,

فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ .

ঋতুবতী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মাসজিদে অবস্থান আমি বৈধ মনে করি না।[৮৯]

রমাযানের পর ইচ্ছে করলে ওই ইতিকাফের কাযা আদায় করতে পারবে। তবে করাটা আবশ্যক নয়; বরং মুস্তাহাব।

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ فَقَالَ " مَا هَذَا ". قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ ". فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে আয়েশা ؓ তাঁর কাছে ইতিকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর হাফসা ؓ আয়িশা ؓ-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তা দেখে যায়নাব বিনতু জাহশ ؓ নিজের জন্য তাঁবু লাগানোর নির্দেশ দিলে তা পালন করা হল। আয়িশা ؓ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সলাত আদায় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'এ কী ব্যাপার?, লোকেরা বলল, আয়েশা, হাফসা, যায়নাব ؓ-এর তাঁবু। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'তারা কি নেকী পেতে চায়? আমি আর ইতিকাফ করবো না।, এরপর তিনি ফিরে আসলেন। পরে সাওম শেষ করে শাওয়াল মাসের দশ দিন ইতিকাফ করেন।[৯০]

আল্লাহ তা'আলা প্রিয় বোনদের সুস্থতার সাথে রমাযানগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন আমীন। ◻◻

---

[৮৭] *সহীহ মুসলিম হা : ৪৯৯৪*

[৮৮] *সূরা আন-নিসা আয়াত : ৪৩*

[৮৯] *আবু দাউদ, দুর্বল হাদীস হা : ২৩২*

[৯০] *সহীহ বুখারী হা : ২০৪৫*

শুব্বানে পাতা صفحةالشبان

কুরআন বুঝার জ্ঞান বা উলূমুল কুরআন

সংকলক : ড. মুহাম্মাদ আহমাদ মুইয *
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : **সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব***

উলূমুল কুরআন : ৪

কুরআনের সাতটি হরফ

আসবাবুন নুযূল

সালাফ আলেমগণ উলূমুল কুরআন বা কুরআন বুঝার মূলনীতির আনুচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আসবাবুন নুযূল জানার ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। যার অন্যতম একটি উদ্যোগ হচ্ছে আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে স্বতন্ত্র লেখনী।

আসবাবুন নুযূল জানার ক্ষেত্রে কিসের ওপর নির্ভর করা হয় : আসবাবুন নুযূল জানার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় যে, বর্ণনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কী না। কারণ কোনো সাহাবা যদি স্পষ্টভাবে আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে সংবাদ দেয় তবে সেটা তার রায় বা মতামত নয়, বরং সেটা মারফূর (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণিত) পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। আল্লামা ওয়াহিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছে, অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে অবগত আছে এবং এর কারণ খুঁজেছে এমন ব্যক্তিদের (সাহাবাগণ) থেকে রেওয়াইয়াত ও শ্রুতি ব্যতীত আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে কোনো কথা/বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না।[৯১]

এটাই সালাফদের পথ। এটাই তাদের নীতি। আসবাবুন নুযূল এর ব্যাপারে অসাব্যস্ত কোনো বিষয়ে কথা বলা থেকে তারা দূরে থাকতেন। মুহাম্মাদ বিন সীরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমি উবাইদাহকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন :

তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যারা জানতেন তারা গত হয়ে গিয়েছেন (তিনি এর দ্বারা সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করেছেন)।[৯২]

ইমাম সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট শর্তসাপেক্ষে আসবাবুন নুযূলের ক্ষেত্রে তাবেঈদের কউল গ্রহণ করা যাবে।

আসবাবুন নুযূল কী?

আসবাবুন নুযূল মূলত দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ :

১. কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া। যেমন ইবনে আব্বাস রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন এ আয়াত وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা (পর্বতে) আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ' বলে সকলকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল, তোমার ব্যাপার কী? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত; তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেনঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ 'আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক'।[৯৩]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তার বর্ণনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া। যেমনটি

---

* *উসতাযুল কুরআন, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব*

* *অধ্যয়নরত, শারীয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা*

[৯১] *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, সুয়ূতী : ১/১১৪*

[৯২] *আসবাবুন নুযূল, ওয়াহিদী : ০৯*

[৯৩] *সহীহ বুখারী হা : ৪৮০১*

ঘটেছিল খাওলাহ বিনতে সালাবার সাথে, যখন তার স্বামী আউস বিন সামিত তার সাথে যিহার করেছিল। খওলাহ তখন রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, বরকতময় সেই সত্তা যাঁর শ্রবণশক্তি সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমি সা'লাবার কন্যা খাওলা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কিছু কথা শুনলাম এবং কিছু কথা আমার অজ্ঞাত থেকে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার যৌবন উপভোগ করেছে এবং আমি আমার পেট থেকে তাকে অনেক সন্তান উপহার দিয়েছি। অবশেষে আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম এবং সন্তানদানে অক্ষম হলাম, তখন সে আমার সাথে যিহার করেছে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকটে আমার অভিযোগ পেশ করছি। অতঃপর বেশি সময় অতিবাহিত না হতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম-এসব আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন। (অনুবাদ) 'আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে নিজের স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করছে... '।[৯৪]

একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় : এর মানে এই নয় যে, প্রতিটি আয়াতেরই অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কারণ পাওয়া যাবে। পুরো কুরআন ঘটনা ও প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়নি; বরং কুরআনের এমনও অংশ রয়েছে যা ইবতিদাঈ বা প্রারম্ভিক; যেখানে আকীদা, ঈমান, ইসলামের আবশ্যকীয় বিষয়াবলী ও শরীয়ত সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। ইমাম আল-জা'বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

'কুরআন দুইভাগে নাযিল হয়েছে - ১. প্রারম্ভিক এবং ২. কোনো ঘটনা অথবা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে'।[৯৫]

আসবাবুন নুযূলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি : আসবাবুন নুযূলের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে এর মাঝে অতীত ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্তি এক ধরনের বাড়াবাড়ি। (যেমন : কেউ কেউ বলে যে, সূরা ফীল নাযিল হওয়ার কারণ হলো হাবশী বাহিনীর মক্কা আসার ঘটনা; অথচ এটা উক্ত সূরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নয়।)

আসবাবুন নুযূল জানার উপকারিতা :

১. বিভিন্ন বিধান অবতীর্ণের পেছনের হিকমাহ বর্ণনা।

২. কুরআন বুঝার জন্য আসবাবুন নুযূল জানা একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। ইমাম আল-ওয়াহিদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

'কোনো আয়াতের পেছনের ঘটনা ও অবতীর্ণের কারণ জানা ব্যতীত তার তাফসীর জানা সম্ভব নয়'।[৯৬]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : 'আসবাবুন নুযূল জানার ফলে কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ বোঝা সহজ হয়'।[৯৭]

৩. আসবাবুন নুযূলের মাধ্যমে আয়াত কার ওপর বা প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে সেটা জানা যায়, যাতে করে কেউ অন্যের বা ভিন্ন ঘটনার ওপর এর প্রয়োগ করতে না পারে।

আসবাবুন নুযূলের বাক্যরূপ :

আসবাবুন নুযূলের বাক্যরূপ দু'ভাবে হতে পারে :

১. সরীহ (صريح) বা সুস্পষ্টভাবে আয়াত নাযিলের কারণ বুঝাবে। যেমন কোনো বর্ণনাকারী যদি বলে,

- 'سبب نزول هذه الآية كذا' (এ আয়াত নাযিলের কারণ হলো এটা) অথবা

- ঘটনা উল্লেখের পর যদি অতঃপর বুঝানোর 'ফা' হরফ আসে তবে; যেমন

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية.

(রাসূল ﷺ-কে অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে/ঘটনা ঘটলে এ আয়াত নাযিল হয়);

এ দুটি হচ্ছে আসবাবুন নুযূল বুঝানোর সুস্পষ্ট বা সরীহ বাক্যরূপ।

২. আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বুঝানোর সম্ভাবনা রাখে এমন বাক্য। যেমন বর্ণনাকারী যদি বলে, ' نزلت

---

[৯৪] *সূরা আল-মুজাদালা আয়াত : ১, সহীহ ইবনে মাজাহ হা : ১৮৮*

[৯৫] *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্নাউল ক্বাত্তান : ৭৮*

[৯৬] *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, সুয়ূতী : ১/১০৮*

[৯৭] *মুক্বাদ্দিমাহ ফী উসূলিত তাফসীর, ইবনে তাইমিয়্যাহ : ১৬*

‘هذه الآية في كذا’ (আয়াতটি অমুক বিষয়ে অবতীর্ণ), তবে এর দ্বারা দুটো বিষয়ের উদ্দেশ্য হতে পারে :

ক. এটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ,

খ. অথবা এটি আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত

একইভাবে, যদি কোনো রাবী বলে যে, ‘আমি মনে করি এ আয়াত অমুক প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে’ অথবা ‘আমি মনে করি না যে, আয়াতটি এ বিষয়ে ছাড়া অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে’; তবে এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বর্ণনাকারী প্রেক্ষাপটের বিষয়ে সুনিশ্চিত নন।

একটি আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে একাধিক বর্ণনা :

একটি আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে একাধিক বর্ণনা বা রেওয়ায়েত আসতে পারে। এমতাবস্থায় একজন মুফাসসিরের অবস্থান হবে নিম্নরূপ :

১. যদি বর্ণিত বাক্যরূপগুলো সরীহ বা আসবাবুন নুযূলের দিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত না করে তবে বুঝতে হবে এগুলো দ্বারা আয়াতটির তাফসীর উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। তবে বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোনো একটিতে যদি অবতীর্ণের কারণ বর্ণনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (ক্বরিনাহ) তবে সেটিকে শুধুমাত্র কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে, আর বাকিগুলো তাফসীর হিসেবে গণ্য হবে।

২. যদি আসবাবুন নুযূল বর্ণনার বাক্যগুলোর একটি সরীহ বা সুস্পষ্ট না হয় এবং অন্যটি সুস্পষ্টভাবে আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তবে সুস্পষ্টটাই কারণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. যদি বর্ণনা একাধিক হয় এবং সবগুলোই আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের দিকে ইঙ্গিত করে এবং যেকোনো একটির সানাদ সহীহ হয়, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য।

৪. যদি বিশুদ্ধতার দিক সকল বর্ণনাই সমপর্যায়ের হয় এবং যেকোনো একটির মাঝে তারজীহ দেওয়া সুযোগ থাকে (যেমন : ঘটনাবহুল বর্ণনা অথবা তুলনামূলক বেশি সহীহ) তবে প্রণিধানযোগ্য বর্ণনাই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট হিসেবে ধর্তব্য হবে।

একটি শানে নুযূল, একাধিক আয়াত :

কখনো কখনো একই প্রেক্ষাপটে একাধিক আয়াত নাযিল হতে পারে। যেমন :

-উম্মু সালামা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা’আলাকে হিজরতের বিষয়ে মেয়েদের নিয়ে কিছু বলতে শুনলাম না। আল্লাহ্ তা’আলা তখন নাযিল করেন,

إِنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.

আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠা পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[৯৮]

-উম্মু উমারা আল আনসারিয়্যা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হা থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, সবই তো দেখছি পুরুষদের জন্য মেয়েদের জন্য কিছুর উল্লেখ হতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়-

﴿إِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

(আবু ঈসা বলেন) হাদীসটি হাসান-গারীব। এ সূত্রেই আমরা এটি সম্পর্কে জানি।[৯৯]

-উম্মু সালামা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্‌হা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুরুষরা জিহাদ করে অথচ মহিলারা জিহাদ করতে পারে না। আর আমাদের জন্য (পুরুষের তুলনায়) মীরাসের অর্ধেক হিস্যা মাত্র। তখন আল্লাহ্ তা’আলা নাযিল করেন,

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ-

যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করবে না।[১০০] ❏❏

---

[৯৮] *সূরা আল-ইমরান আয়াত : ১৯৫, সহীহ তিরমিযী হা : ৩০২৩*

[৯৯] *সহীহ, তিরমিযী হা : ৩২১১ [আল মাদানী প্রকাশনী]*

[১০০] *তিরমিযী হা : ৩০২২*

আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহের সংশয় নিরসন

মূল : হুসাইন বিন হাসান বাকের

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান ❄

(২য় পর্ব)

পঞ্চম অপবাদ : রাফেজীদের দাবি, তালহা ও জুবাইর রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা-কে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এসে ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন, তারা তাকে বাড়ি থেকে বের করেননি, বরং যখন উসমান রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু-কে হত্যা করা হয় তখন তিনি মদীনায় ছিলেন না, ছিলেন মক্কায়। তিনি তার হত্যার সময় উপস্থিত ছিলেন না। তালহা ও জুবাইর রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা মক্কায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[১০১]

ষষ্ঠ অপবাদ : আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা প্রশ্ন করলেন, পরবর্তী খলীফা কে হবে? তারা উত্তরে বললেন, আলী বিন আবু তালেব। তখন তিনি উসমানকে হত্যার জন্য বের হলেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন, যারা বলে, আয়েশা, তালহা ও জুবাইর রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুম উসমানকে হত্যা করে আলী রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু-কে হত্যার অপবাদ দেন। তাদের কথা সুস্পষ্ট মিথ্যা।[১০২]

সপ্তম অপবাদ : আহলুস সুন্নাহ শুধু আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা-কে উম্মুল মুমিনীন নামকরণ করেছে।

অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট অপবাদ। আমি জানি না এরা কি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে, নাকি আল্লাহ তাদের চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছেন। যার কারণে তাদের কাছে বিষয়টি গোপন থেকে যাচ্ছে।

অষ্টম অপবাদ : আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা তার অধীনস্ত এক দাসীকে সাজিয়ে বললেন, আমরা এর মাধ্যমে কুরাইশের যুবকদের শিকার করব।

শাইখ আব্দুল আযিয দেহলবী এর উত্তরে বলেছেন, আহলুস সুন্নাহর মতে বিশুদ্ধ সূত্রে এ মর্মে কোনো সংবাদ নাই। তবে অগ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত সনদে দু’জন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে।

শাইখ আব্দুল আযিয দেহলবীর কথায় দুটি সতর্কতা :

প্রথম : রাফেযীদের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীসের মূলনীতি নেই, যাতে তারা হাদীসকে যাচাই করবে। যদি তাদের কাছে কোনো মূলনীতি থাকতো তাহলে নানা প্রকার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। শাইখ আলবানী রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন, যদি আহলুস সুন্নাহ ও শী‘আ উসূলুল হাদীসের (হাদীসের মূলনীতি) ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করতো তাহলে একক বর্ণনায় বিরোধের ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে পেতো। অতঃপর বিশুদ্ধ বর্ণনার প্রতি নির্ভর করতো।

দ্বিতীয় : সেই হাদীসটি ইমাম ইবনু আবি শাইবা মুসান্নাফ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেটি হল :

حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نتصيد بها شباب قريش.

আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা একজন মেয়েকে সাজিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন, এর মাধ্যমে আমরা কুরাইশের যুবকদেরকে শিকার করব।[১০৩]

এই সনদে আম্মার বিন ইমরান ও একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। অপরিচিত ব্যক্তির একক বর্ণনা মুনকার হিসেবে গণ্য করা হয়।

নবম অপবাদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ছেলে ইবরাহীমকে নিয়ে আয়েশা রযিয়াল্লা-হু ‘আন্হা‘র কাছে গিয়ে বললেন, তোমার মতামত কী? উত্তরে তিনি বললেন, যার শরীর ছাগলের মাংসে গড়ে উঠেছে, তার স্বাস্থ্য তো ভালো হবেই। তিনি ঈর্ষা করে একথা বলেছেন।

শাইখ আলবানী রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলেন, এটি খুবই দুর্বল।

❄ *উস্তায, দারুস সুন্নাহ সালাফিয়াহ মাদরাসা, কটারবাবাড়ী, ভারুয়াখালী, ঘোড়াধাপ, জামালপুর।*

[১০১] *মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৩৪৭*

[১০২] *মিনহাজুস সুন্নাহ : ৪/৩৪৩*

[১০৩] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ : ৯/৪৮৩*

দশম অপবাদ : আয়েশা ؓ হাসান ؓ-কে তার নানার পাশে দাফন করতে দেননি। তিনি বলেছেন, এখানে চতুর্থ জনের কবর সম্ভব না। কারণ এ বাড়ি রাসূল ﷺ জীবদ্দশায় আমাকে দিয়ে গিয়েছেন।

ইমাম যাহাবী ؒ বলেন, এ সনদে অসংখ্য অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে।

একাদশ অপবাদ : রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় আয়েশা ؓ বেলাল ؓ-কে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি আবূ বকর ؓ-কে সালাতের ইমামতি করতে বলেন।

রাসূল ﷺ বলেন, مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ তোমরা আবূ বকর ؓ-কে আদেশ কর যাতে সে মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করে।[১০৪] অতঃপর মানুষেরা তাকে সালাতের ইমামতি করার জন্য সামনে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাফেযীদের দাবি, নবী ﷺ তা আদেশ করেননি বরং আয়েশা ؓ বেলাল ؓ-কে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি আবূ বকর ؓ-কে এগিয়ে দেন। এটি তাদের মিথ্যার অন্যতম।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ؒ বলেন, রাসূল ﷺ-এর আদেশের ঘোষক আয়েশা ؓ ছিলেন না। তিনি তার বাবাকে এ আদেশের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং তাদের কথা নিছক মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। মূলত উপরোক্ত কথাটি তিনি বেলাল ও সলাতের জন্য যারা উপস্থিত হয়েছিল সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন। আয়েশা ؓ-কে নির্দিষ্ট করেন নাই। আর বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা ؓ থেকে এটি শুনেননি।[১০৫]

তাদের মিথ্যার কিছু নমুনা :

(১) সূরা আন-নূরে বর্ণিত ইফকের ঘটনার নির্দোষিতার আয়াতগুলো মারিয়া কিবতিয়া ؓ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আয়েশা ؓ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়নি। নিশ্চয় এটা নির্বুদ্ধিতা।

(২) হাফসা ও আয়েশা ؓ রাসূল ﷺ-কে বিষপানে হত্যা করেছে। একথা অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর কাছে সব বিষয়েই ওহী অবতীর্ণ করতেন। যেমন- যখন ইহুদী মহিলা ছাগলের গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা গোশতের টুকরাকে কথা বলার ক্ষমতা দান করেছিলেন। অনুরূপভাবে যখন মুনাফিকরা রাসূল ﷺ-কে পাথর ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলে তিনি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করেন। তাহলে আল্লাহ কি আয়েশা ؓ-র বাড়িতে ও মৃত্যুর সময় তার কাছে ছেড়ে দিবেন! যে তাকে বিষ পান করাবে, তাকে সুযোগ দিবেন। অথচ আল্লাহ নবী ﷺ-কে সর্বদা সাহায্য করেছেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ সর্বক্ষণ স্ত্রীদের সাথে থাকতেন, তিনি অসুস্থতার সময় অবস্থান করতে আয়েশা ؓ-র বাড়িকে বাছাই করেছেন। তার বুকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ তিনি জানবেন না যে, তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। এটা বোধগম্য নয়।

(৩) নবী ﷺ তার ঘরের দিকে ইশারা করে বলেছেন, ফিতনা এখান থেকেই বের হবে। এটাও বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত যেটা করতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের নিন্দা করেছেন। কেননা ইরাক বুঝাতে রাসূল ﷺ পূর্বদিকে ইশারা করেছেন। তাদের মতে ফিতনা বের হওয়ার স্থানেই কি আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে দাফন করালেন!?

আয়েশা ؓ সম্পর্কে সংশয় ও নিরসন :

প্রথম সংশয় : আয়েশা ؓ রাসূল ﷺ-এর গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায় :

(১) রাসূল ﷺ-এর গোপন বিষয় হাফসা ؓ প্রকাশ করেছেন, আয়েশা ؓ নন। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عن عمر بن الخطاب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة : «لا تحدثي أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالت : أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : «فوالله لا أقربها» فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.

---

[১০৪] *সহীহ বুখারী হা : ৬৬৪*

[১০৫] *মিনহাজুস সুন্নাহ : ৮/৫৬৯*

উমর বিন খাত্তাব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাফসা ؓ-কে বলেছিলেন, তুমি কাউকে সংবাদ দিও না, নিশ্চয় ইবরাহীমের মাকে (দাসী মারিয়া কিবতিয়া) আমার ওপর হারাম ঘোষণা করলাম। তখন তিনি বললেন, আপনি কি এমন কিছু হারাম করে নিচ্ছেন যা আল্লাহ আপনার ওপর হালাল করেছেন? তখন উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার নিকটবর্তী হবো না। উমর ؓ বলেন, রাসূল ﷺ তার নিকটবর্তী হননি যতক্ষণ না হাফসা ؓ আয়েশা ؓ-কে এ ব্যাপারটির সংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন।[১০৬]

হাফেয ইবনে কাসীর ؒ বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ। কুতুবে সিত্তার কোনো ইমাম স্বীয় গ্রন্থে সঙ্কলন করেননি। হাফেয জিয়া মাকদিসী তার 'আল-মুখতারা' (১/১১৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৭]

সহীহুল বুখারীর ৪৯১৩ নম্বর হাদীস উপরোক্ত হাদীসকেই সমর্থন করে।

(২) যদি ধরে নেয়া হয় যে, আয়েশা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তাহলে তিনি একটি পাপ কাজ করেছিলেন এবং সেখান থেকে তাওবা করেছেন। আর জান্নাতবাসীদের নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। বরং কখনো কখনো মুমিন ব্যক্তি পাপ করে এবং তাওবা করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, যদি তাওবা না-ও করে সেক্ষেত্রেও কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার কারণে ছগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কত ভালো কাজ রয়েছে ক্ষমা হওয়ার জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় সন্দেহ : আয়েশা ؓ বলেছেন, আমি যতটুকু খাদিজার প্রতি ঈর্ষা করেছি অন্য কোনো নবীপত্নীর প্রতি তদ্রুপ করিনি। অথচ আমি তাকে কখনো দেখিনি। এর কারণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যধিক স্মরণ করতেন। এর উত্তরও দু'ভাবে দেওয়া যায় :

(১) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ؓ-কে খাদিজা ؓর ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। শী'আরা ফাতিমা ؓর মা হওয়ার সুবাদে খাদিজা ؓর ওপর কাউকে প্রাধান্য দেবে না। তাদের দাবি, আয়েশা ؓ ফাতিমার মা হওয়ার কারণে খাদিজা ؓ-কে ঘৃণা করতেন।

(২) ঈর্ষা একটি স্বভাবজাত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী লোকদেরকে ঈর্ষা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এখান থেকে কোনো মহিলা মুক্ত নয়। নবী ﷺ খাদিজা ؓ-কে অত্যধিক স্মরণ করতেন যার ফলশ্রুতিতে আয়েশা ؓ বলেছেন, আল্লাহ তো আপনাকে তার (খাদিজা) থেকে উত্তম কিছু (আয়েশা) দিয়েছেন।

তৃতীয় সন্দেহ : আল-জাওনের কন্যাকে রাসূল ﷺ বিবাহ করেছিলেন। আয়েশা ؓ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, রাসূল ﷺ বাসরের জন্য কাছে আসলে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। তিনি আশ্রয় চাইলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে তালাক দিলেন।

সহীহুল বুখারীতে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا : "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ."

আওযাঈ ؒ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী ؒকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ-এর কোনো সহধর্মিণী তার থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল? উত্তরে তিনি বললেন, উরওয়া ؒ আয়িশাহ ؓ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (বাসর ঘরে) পাঠানো হল আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়

---

[১০৬] *সূরা আত্-তাহরীম আয়াত : ০২*

[১০৭] *তাফসীর ইবনে কাসীর : ৮/১৫৯*

চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও।[১০৮]

শিখিয়ে দেওয়ার কথাটি অতিরিক্ত। যার মাধ্যমে আয়েশা রযিয়াল্লা-হু 'আন্হার ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ইবনু সা'দ অতিরিক্ত কথাটি আত-তবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন, অতিরিক্ত বর্ণনাটি বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হয়নি। সনদের দিক দিয়ে তা নিতান্তই দুর্বল।[১০৯]

চতুর্থ সন্দেহ : তিনি সালাত পরিবর্তন করেছেন। তিনি সফর অবস্থায় চার রাকআতবিশিষ্ট সালাতকে পূর্ণ করেন।

সফর অবস্থায় আয়েশা রযিয়াল্লা-হু 'আন্হা সালাত পূর্ণ করার প্রতি মত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম যুহরী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) উরওয়া (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা রযিয়াল্লা-হু 'আন্হা কেন সলাত পূর্ণ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন ব্যাখ্যা করেছেন অনুরূপ ব্যাখ্যা তিনিও করেছেন।[১১০]

এর উত্তর চারভাবে দেওয়া যায় :

(১) কোনো দিক থেকেই তাকে অভিযুক্ত করা যায় না। সফর অবস্থায় পূর্ণ ও কসর করার ব্যাপারে অনেক মতামত বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইজতিহাদ করেছেন যে, পূর্ণ করা ও কসর করা উভয়টি জায়েয। দুটির কোনো একটি ইখতিয়ার করা যায়। অতঃপর তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুসারে যথাযথভাবে ইবাদাত করার জন্য পূর্ণ করাকে বেছে নিয়েছেন। আর সফর অবস্থায় যার জন্য পরিপূর্ণ আদায় করা কষ্টকর মনে হবে সে কসর করবে। তার ওপর কষ্ট অনুভূত হতো না বিধায় তিনি পূর্ণ আদায় করতেন।

উরওয়া (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) তাকে বলেছিলেন, আপনি যদি চার রাক'আতের স্থলে দু'রাক'আত আদায় করতেন তাহলে ভালো হতো। তখন উত্তরে তিনি বললেন, হে ভাগিনা! তা আমার কষ্ট অনুভূত হয় না। ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) আস-সুনানুল কুবরায় (৩/১৪৩) উল্লেখ করেছেন।

(২) তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কসর করার প্রতিবাদ জানাননি। যার কষ্ট অনুভূত হবে না তার পক্ষে পূর্ণ করাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি উরওয়া (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)কে পূর্ণ করার আদেশ দেননি যখন তিনি বলেছিলেন, যদি আপনি দু'রাক'আত পড়তেন ভালো হতো।

(৩) তার জ্ঞানের গভীরতা অনেক ছিল। সাহাবীরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকে জিজ্ঞেস করে নিতেন। তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দুই নেকি, ভুল হলে এক নেকি। মুজতাহিদের জন্য এমন কোনো শর্ত নেই যে, তার ভুল হতে পারে না।

(৪) উম্মুল মুমিনীনের প্রতি অভিযোগ উত্থাপিত করাই হল উত্থাপনকারীদের রাগ নিবারণ করা। প্রকৃত মুমিন ওজর খোঁজে। তার মর্যাদার কারণে এ সামান্য ব্যাপারে কোনো কিছু মনে করে না। তার এ মতের ব্যাপারে সালফে সালেহীন এ পন্থায় অবলম্বন করেছেন। (চলবে, ইনশা আল্লাহ)

ইফতারের পূর্বে নিম্ন দু'আটি পড়া যায়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিরাহ্মাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আন্ তাগ্ফিরা লী। *ইবনে মাজাহ, সহীহ-মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ হা : ৬৩৬*

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু বেষ্টন করে রেখেছে তার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই- তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

এরপর 'বিস্মিল্লাহ' বলে ইফতার করবে এবং ইফতার শেষে 'আল্-হাম্দুলিল্লাহহ' বলবে ও ইফতার করার পরের দু'আ পড়বে। মুখতাসার ফিক্হ আল ইসলামী- ৬৩৪ পৃ:

---

[১০৮] *সহীহ বুখারী হা : ৫২৫৪*
[১০৯] *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ৪/৫১*
[১১০] *সহীহ বুখারী হা : ১০৯০, সহীহ মুসলিম হা : ৬৮৫*

শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বস : জাতির গন্তব্য কোথায়?

মাযহারুল ইসলাম[❋]

বলা হয় "Education is the backbone of a nation" শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সত্যিই কি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড? তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন! বিজ্ঞজন বলছে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' নয় বরং 'সু-শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। তা যাই হোক, শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তার গভীরতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তা বিবেচনা করা সময়ের যথার্থ দাবি। শিক্ষা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখা দরকার।

কেবলমাত্র সু-শিক্ষাই মানুষকে সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহীয়ান করে তোলে। নিকষ আঁধার চিরে 'পড়' এর উজ্জ্বল আলোর ফিনকিতে মানুষ গড়ে ওঠে 'আলোর, সত্যের ও সোনারমানব হয়ে। কবি ওমর খৈয়াম বলেছিলেন- 'সূর্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সবকিছু পরিস্ফুটিত হয়ে ভাস্বর হয় ঠিক তেমনি জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে'।

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই বল। উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের একমাত্র পথ ও পন্থা হলো শিক্ষা। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে শিক্ষাই মানব জীবনকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও সমাজ পরিবর্তনের এক নির্ভীক চির জাগ্রত রাহবার তৈরি করে। শিক্ষাবিহীন জাতি বিকলাঙ্গ, অধম , মৃতপ্রায়। শিক্ষাবিহীন জাতি হল বর্বর, অবিবেচক। শিক্ষাবিহীন মানুষের রূহ তথা আত্মা অসাড় দেহ। মানুষের রূহ ছাড়া যেমন শরীরকে মানুষ বলা যায় না ঠিক তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জীবনকে সার্থক, সফল ও পরিপূর্ণ জীবন বলা যায় না। এজন্য চমৎকার কথা বলেছেন - সিসরো-, যতই উর্বর হোক , একটা জমি যতক্ষণ কর্ষণ দেয়া হয় না ততক্ষণ ফসল দিতে পারে না, ঠিক শিক্ষাও তেমন'। শিক্ষা তথা জ্ঞান সময়, স্থান ভেদে এর চাহিদা, গুরুত্ব ও মর্যাদা সবসময়েই অভিন্ন ও প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে- 'শিক্ষা ও জীবন আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই,। সক্রেটিস বলেছেন - লোহা কেবল যুদ্ধের মাঠেই সোনার চেয়ে দামী। এজন্য শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং যথার্থ ভূমিকা পালন করা মানে আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার গ্রহণ করা। শিক্ষার ভিত্তি শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবার শিক্ষিত হলে জাতির সন্তান যারা অনাগত ভবিষ্যতের রূপকার, কাণ্ডারী তারা শিক্ষিত, পরিমার্জিত ও সুশাসনের দেশ ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হবে। যেখানে নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা থাকবে। যেখানে দুর্নীতির কালো হাত ভাঙা হবে। যেখানে শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার পাবে। এজন্য পরিবার শিক্ষার বুনিয়াদি ও প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও সামনে চলার সর্বোত্তম যোগান, অনুপ্রেরণা। শিক্ষাবিদগণ পরিবারকেই শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিবারের সকল সদস্য শিক্ষিত হলে তো কোনো কথাই নেই। কল্যাণে ভরপুর। তবে সবাই শিক্ষিত হোক বা না হোক 'মা' শিক্ষিত হওয়া মানে জাতি শিক্ষিত পাওয়া। শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদি ভিত্তি ও হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছেই। এজন্য শিক্ষিত মা একটা পরিবারের জন্য অতীব জরুরি। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন - Give me a good mother, I will give you a good nation." আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দিবো'।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজকে শিক্ষিত মা যারা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করার ইচ্ছায় দিন রাত ছুটছে, পড়াচ্ছে অথচ সেই আদরের সন্তানকে সু-শিক্ষিত করতে পারছে না। কারণ সন্তানকে শিশু অবস্থায় নৈতিক শিক্ষা তথা রূহের খোরাক দিতে সক্ষম হয়নি আজকের তথাকথিত আধুনিক অভিভাবকবৃন্দ। যারা সন্তানকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায়। একজন আদর্শ মা-বাবার জন্য আবশ্যকীয় করণীয় হল-সন্তানকে শিশু অবস্থা থেকেই রূহের উন্নতি সাধনের শিক্ষার সবক দেয়া, অতঃপর সেই বুনিয়াদি শিক্ষা শিশুমনে ভিত্তি করে আগামীর জীবনে চলবে অনায়াসে, সৎ, নিষ্ঠাবান ও নির্ভীক আদর্শ নাগরিক হিসেবে। শিক্ষার তথা পরিবারের প্রাথমিক পর্যায়ে এটাই বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রিয় পাঠক! আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চারটি স্তর বিদ্যমান - (১) প্রাথমিক, (২) মাধ্যমিক, (৩) উচ্চ মাধ্যমিক, (৪) উচ্চ শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই শুরু হয় আমাদের শিক্ষা জীবনের যাত্রা। একটা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল হার্ট। হার্ট ছাড়া দেহের যেমন মূল্য থাকে না ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা হার্ট সমতুল্য স্পর্শকাতর। প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শিক্ষার ভিত্তি। তাই শিক্ষার এ গোড়ায় পানি ঢালা উচিত। এর উন্নতি সাধন ও উত্তরোত্তর কল্যাণকল্পে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করা উচিত।

[❋] *অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

মনীষীর বক্তব্য- শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোঁদাই করা ছবি অঙ্কনের মতো স্থায়ী হয়। শিশুমনের নরম জমিনে সুশিক্ষার বীজ রোপণ করা মানে ভবিষ্যতে সৎ ও সাহসী জাতি গঠনের মূল দায়িত্ব পালন করা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান যে করুণ পরিস্থিতি তা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। ইহুদী খ্রিষ্টান আর মালাউন হিন্দুত্ববাদীর আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা চরম ক্ষতির সম্মুখীন। ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা। বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা চলছে, এমনকি বাংলাদেশের শিক্ষা সিলেবাস পর্যন্ত তারা বাদ দিয়ে নিজস্ব সিলেবাস প্রণয়ন করে পাঠদান করছে। তেমনি একটি সংস্থা 'ব্র্যাক'। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করা হয় দেশের সবকিছু চিন্তা করে, দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সবকিছু সমন্বয় করে সিলেবাস প্রণয়ন করে দেশের শিক্ষা কমিশন মন্ত্রণালয়। অথচ ব্র্যাক সব কিছুকে পাত্তা না দিয়ে নিজেই শিক্ষার রাজ্যকে শাসন করার আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার এই ধারা চলমান থাকলে বেশি দিন লাগবে না এ দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যাবে। জাতির শিক্ষাব্যবস্থা চরম হুমকির সম্মুখীন হবে। ভবিষ্যতে জাতি অকর্মা, অদক্ষ, অযোগ্য ও প্রায় বিকলাঙ্গ জাতি উপহার পাবে। যাদের কোনো উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল শক্তি সঞ্চার করবে না। সব মেধাবীকে চালান করে নিয়ে দেশকে করবে মেধাশূন্য । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষার নামে মেধা চালান সচল রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষাসহ দেশের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত চলছে ছিনিমিনি খেলা। এই দূরভিসন্ধির সূচনা করেছে খ্রিষ্টান মহল। তারা তাদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এই ষড়যন্ত্র করেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাঠি নেড়ে শিক্ষাকে বিকলাঙ্গ শিক্ষায় পরিণত করে বহুকাল গোলাম বানিয়ে রাখবে বলে তারা গভীর ষড়যন্ত্রের নগ্ন পাঁয়তারা চালায়। ফলে বাংলাদেশের মানুষ নামমাত্র স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিকানা হলেও সর্বক্ষেত্রে পরাধিনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, চাই তা রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজরা লেজ গুটিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে লর্ড ম্যাকলের ভাষ্য ছিল-

We must at present do our best to from a class who maybe interpreters between us and millions whom we govern a class of person Indian in blood and colour but English in taste in openion in moral and intellect.

অর্থ- বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এমন এক জাতি সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা আমাদের ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ জনগণের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করবে। যারা রক্ত, বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচিতে, চিন্তা-চেতনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধি-বৃত্তিতে হবে ইংরেজ।

যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বাঙালি সমাজ ইংরেজদের গোলামীর শিকার। ইংরেজরা মূলত শিকলে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে গোলামী করাতে চায়নি। কারণ এই পদ্ধতিতে যে কেউ গোলামী করতে বাধ্য। তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় গোলামী জীবন যাপন করাতে বাধ্য করে। যা আমাদের বাঙালি সমাজ একটুও অনুধাবন করে না।

ব্রিটিশ মন্ত্রী গ্লাডস্টোন বলেছিল- So long as the Muslim have the Qur'an we shall be unable to dominate them.

We must either take it from them or make them lose their love at it.

অর্থ - যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ তাঁদেরকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের থেকে কুরআন কেড়ে নিতে হবে নতুবা তাদের হৃদয় থেকে কুরআনের ভালোবাসা মুছে দিতে হবে।

এজন্য তারা বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষাকে মাইনাস করে ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে জাতির বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করা।

দেশের শিক্ষার মূলধারা হলো প্রাথমিক শিক্ষা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ভাবনা সুদৃঢ় হয়। কিন্তু মূলধারার শিক্ষাকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নাস্তিক্যবাদী ও ছবি মূর্তি আর অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়ার মতো শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। যা সত্যিই এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে বেশ কয়েকবার। যেমন -

১. ড. কুদরত-এ-খোদা শিক্ষা কমিটি ১৯৭২- ১৯৭৪ সাল।

২. কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি ১৯৭৮ সাল।

৩. ড. মজিদ খান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৩ সাল।

৪. ড. মফিজ উদ্দিন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৮৭ সাল।

৫. ড. শামসুল হক শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৬ সাল

৬. অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি।

৭. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী জাতিয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০১০ সাল।

জাতিয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের সমাধান আজ অবধি হয়নি। শিক্ষানীতির ওপর নির্ভর করে দেশের হালচাল, সততা, উন্নতি, নীতি নৈতিকতার উজ্জীবিত শক্তি ও সমাজ সংস্কারের এক মাইলফলক দৃষ্টান্ত।

অথচ দেশের জাতিয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে, প্রণয়ন একবার নয় একাধিকবার হয়েছে যেখানে সু-শিক্ষার সবক বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি বরং তার জায়গা দখল করেছে কু-শিক্ষা। যে শিক্ষা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যে শিক্ষা দেশ ও জাতির দুর্নীতির পথকে উন্মুক্ত করে দেয়, যে শিক্ষা অশ্লীলতার সুড়সুড়ি দেয়, সে শিক্ষা আদৌ কোনো জাতির জাতিয় শিক্ষানীতি হতে পারে? তা বিবেকবানের বিবেচনা করা সময়ের দাবি।

শিক্ষা কারিকুলামের ভিত্তি যত শক্তিশালী হবে জাতির অনাগত ভবিষ্যৎ তত বেশি উন্নতি অগ্রগতির ভিত্তি আরো বেশি মজবুত ও সুদৃঢ় হবে। জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিয় চাহিদা পূরণের দাবি রাখে ও তা পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই শিক্ষাব্যবস্থা যদি কোনো সাম্রাজ্যবাদী কিংবা ভিন দেশীয় শিক্ষা কারিকুলামের সাজে সজ্জিত করা হয় তাহলে তার দ্বারা জাতি সত্যিকারঅর্থে কখনোই সাফল্য ও জাতিয় জীবনে সমাজ সংস্কারের আদৌ কোনো অবদান রাখতে সচেষ্ট হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, ভিন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা দেশের উন্নতির অন্তরায়ের মাঝেও জাতিয় স্বদেশী সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে পদদলিত করবে এবং সেই সাথে ভিন দেশীয়দের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে কোনো কার্পণ্য করবে না। এজন্যই ইহুদী খ্রিষ্টান মহল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নাক গলিয়েছে। একক আধিপত্য বিস্তার করতে তারা শিক্ষাব্যবস্থায় গভীর পরিকল্পনা করে তাদের মতো করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎস 'ওহী'। জাতিয় জীবনের উন্নতি ও এক সফল, সার্থক সমাজ জাতিকে উপহার দেয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রথমেই আত্মা ও রূহের উন্নতি সাধনের জন্য 'পড়ো' শব্দের ওপর ভিত্তি করে তাওহীদের গুরুত্ব, পরকালমুখী জাতি এবং এই ঠুনকো দুনিয়ার তুচ্ছতার ওপর আখেরাতকে পেশ করে সৎ নির্ভীক জাতির প্রত্যাশা করে মূলতঃ ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ﴾

অর্থ, কোনো ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও' 'বরং তিনি বলবেন, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।[১১১]

আজকের শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র করুণ। ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করে জাতিকে সীমাহীন ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যা সময়েই সকলে বুঝতে পারবে। আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের কথা ভুলিয়ে বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষার প্রতি লোভনীয় করে তোলা হচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায়। সন্তানকে শিশু বয়স থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টান্ত পেশ করছে সুদি, মুনাফাভিত্তিক গণিতের মাধ্যমে। প্রবন্ধ, ছড়া আর গল্পে মিথ্যার জগাখিচুড়ী নিয়ে কচি বয়সের ছাত্রছাত্রীর ফ্রেশ মস্তিষ্ককে ধোলাই দিচ্ছে আজকের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা।

মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি (Theory of evolution) তথা বিবর্তন মতবাদ বর্তমান শিক্ষা সিলেবাসের অন্যতম অংশ। চিন্তা করুন! মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি। মানুষের আদি পিতা বলতে বানর। আমরা বানরের সন্তান!! ভাবতে অবাক লাগে 'ডারউনের' এই পচা মতবাদ খোদ ইহুদী খ্রিষ্টান মহলই মানতে পারেনি বরং এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অথচ আমরা শিক্ষা সিলেবাসে এমন পচা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করছি কোনো বিবেকে? সত্যিই লজ্জার বিষয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এমন ষড়যন্ত্র সেটাও সবার জানা। শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বস কি এমনিতেই হবে। যদি তার যথেষ্ট কারণ না থাকে তাহলে তো আর এমনি এমনি ধ্বস নামবে না। জ্বি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সিলেবাস নির্ধারণে প্রায় সব সদস্য হিন্দু নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর চাহিদা ও আবদার পূরণে যথেষ্ট অভাব, ঘাটতি থেকে যায়। প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া ছাড়াও প্রায় সকল পড়াতেই হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ছাপ থাকে, ফলে মুসলিম ঘরের ছেলে-মেয়ে নামমাত্র মুসলিম পরিচয় দেয় আর তার মাথায় ভর করে পাঠ্যবইয়ের সেই হিন্দুয়ানী রসম রেওয়াজ,

---

[১১১] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৭৯*

দেবী প্রতিমার। মুসলিম কবি সাহিত্যিকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আজ আর সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শুধু বাংলার বিদ্রোহী কবির উপাধি পেয়েই ক্ষ্যান্ত হতে হলো। দেশের জাতিয় শিক্ষানীতির সিলেবাসের সীমানায় আসার সুযোগটা তাই বুঝি হারিয়েছে! যেহতু তিনি কারো তেলবাজি করতে পারে নি তাই পেছনেই থাকতে হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রটা এমনই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, তার বাস্তব কিছু নমুনা পেশ না করে পারছি না। পাঠকমহল একটু চিন্তা করবেন আর বিবেকের কাছে প্রশ্ন করবেন জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এমন শোচনীয় হয় তাহলে এই জাতির দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী আশা করতে পারে?

১) কোনো এক কবি, সাহিত্যিক লিখেছেন -

'যদি মরণের পরে কেউ প্রশ্ন করে বলব আমি বাঙালি'

২) প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ'।

৩) ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

৪) একটি স্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি..!

৫) 'তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে তবেই বাসা ফিরব লক্ষ্মী মা, রাগ করো না মাত্র তো আর কটা দিন'।

এছাড়াও ঈমান বিধ্বংসী ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ভরপুর আজকের শিক্ষা সিলেবাস। ফলে একদিকে যেমনিভাবে ঈমান নষ্ট হয়ে কুফরীতে নিমজ্জিত হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য যৌনতা সুড়সুড়ি দেয়ার মত গল্প, কবিতা ও উপন্যাসও সিলেবাসে নতুন মাত্রায় যুক্ত আছে। ক্লাসে তো ফ্রি মিক্সিং আছেই। এমনকি বয়ঃসন্ধিকাল, মাসিক পিরিয়ডসহ অপ্রীতিকর লজ্জাজনক বিষয়গুলো স্পেশালভাবে সবাইকে ফ্রি মাইন্ডে পাঠদান করার জন্য উৎসাহিত করছে। ছেলে-মেয়ের একসাথে শিক্ষায় তরুণ প্রজন্মের বর্তমান জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে। ফলে যৌনচর্চা ও যৌন পরিতৃপ্তির এক অশ্লীল প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে নৈতিকতার সব বাঁধন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ইংরেজদের এই শিক্ষাধারায় নীতিহীন ও চরিত্রহীন জাতি গঠনের যে শিক্ষা প্রণয়ন করে দিয়েছে তার গোলামী এখন পর্যন্ত চলছে। এই গোলামীর দিন কবে শেষ তা বলা মুশকিল। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের শিক্ষা সমস্যা বিজ্ঞজনরা ভালোই করে অবগত আছেন। বস্তুবাদী, ভোগবাদী শিক্ষা মানুষকে শুধু উদরপূর্তি করতেই বলে। খাও দাও ফুর্তি করো! সবক দেয়। আর এই সবক পেয়ে দুনিয়া পূজারীরা ন্যায়-অন্যায়ের পথ বাচবিচার না করে দুনিয়া, দুনিয়া বলে ছুটছে। নিজের হাতে সন্তান বাবা-মা কে হত্যা করছে, আগুনে পোড়াচ্ছে, মৃত্যুর সময় জানাযায়ও সন্তানকে পাচ্ছে না, অথচ সেই সন্তানের শিক্ষার জন্য ঐ অভিভাবকগণ কত টাকা পয়সা আর ত্যাগ বিসর্জন দিয়েছেন। পরিশেষে ফলাফল জিরো। কারণ বস্তুবাদী শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষা কখনোই কাউকে অমানুষ বানায় না। বরং অমানুষকে মানুষ বানায়। বাংলাদেশের মানবাধিকার ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে এক জরিপে জানা যায় - দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি নাজুক পরিস্থিতি- ঢাকার এক স্কুলের ৯ম শ্রেণীর মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাস রুমে বসে পর্ণোগ্রাফী দেখার সংখ্যা ২৫ জন পাওয়া যায়। পরে প্রধান শিক্ষক মোবাইলগুলো ভেঙে দেন। এই হলো চলমান শিক্ষার অশুভ দর্শন। পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতির রঙে রঙিন করতে ব্রিটিশরা এ শিক্ষা দিয়ে গেছে। যেন এ স্বাধীন জাতি স্বাধীনভাবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। তাঁরা যেন পরাধিনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে যুগের পর যুগ। এই মানসে শিক্ষাব্যবস্থায় ছুরি চালিয়েছে। আর তার গোলামী করতে হচ্ছে আজোও। শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে চাইলে প্রয়োজন আজকে বাংলা সাংবাদিকতার জনক খ্যাত 'মাওলানা আকরাম খাঁর' দৃষ্টি দর্শন।

ইতিহাস বলছে, স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। পরে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় মাওলানা আকরাম খাঁ। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস সাক্ষী! পাকিস্তান আমলে এটাই ছিল প্রথম শিক্ষা কমিশন।

তাই শিক্ষার এই মূল ধারায় ফিরে না আসা ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষায় আমূল ব্যাপক পরিবর্তন আশা করা মানে উলুবনে মুক্তা ছিটানো ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা চাই এক উন্নত, মানসম্মত, যোগ্য, সৎ ও দক্ষ, কর্মঠ জাতি গঠনের শিক্ষা সিলেবাস। যার আদলে জাতি ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মানদণ্ড নিরূপণ করতে পারবে। সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে। সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হবে মানবমন। সেদিন বেশি দূরে নয় ইনশা আল্লাহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঐ স্বার্থান্বেষী মহল থেকে মুক্ত হয়ে আবার সকলে স্বাধীন হবে চিন্তার, বুদ্ধির জগতেও। গোলামের দাসত্ব ছিন্ন হয়ে তাওহীদের শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে ইসলাম শিক্ষাই হবে বাংলাদেশের মানুষের জাতিয় জীবনের উন্নতির সোপান ইনশা আল্লাহ!!!

ফাতাওয়া ও মাসায়েল الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

☞ প্রশ্ন (১) ঃ দীর্ঘ অনেক বছর রজব মাস এলেই একটি দু'আ উৎসাহ নিয়ে পড়তাম। দু'আটি হলো- আল্লাহুমা বারিক লানা ফী রাজাবিওঁ ওয়া শা'বান ওয়া বাল্লিগনা রমাযান। রজব ও শা'বান মাসব্যাপী আগে দু'আটি পড়লেও এখন শুনতে পাচ্ছি দু'আটি বিশুদ্ধ নয়। এই প্রসঙ্গে সঠিক বক্তব্য জানতে চাই।

খলিলুর রহমান, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

উত্তর ঃ রজব ও শা'বান মাসে আপনি যে দু'আটি পাঠ করে এসেছেন তার দলীল নিম্নরূপ :

عَن أنس رضى الله عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل رَجَب قَالَ اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي رَجَب وَشَعْبَان وبلغنا رَمَضَان

আনাস রযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, যখন রজব আসত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন। (আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রাজাবিওঁ ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমাযান।

হে আল্লাহ আপনি রজব ও শা'বান মাসে বারাকাত দান করুন এবং রমাযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।[১]

উল্লেখিত দু'আসম্বলিত হাদীসটির সনদ দুর্বল।[২]

হাদীসের একজন রাবী 'যায়িদা বিন আবির রুকাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন 'তিনি মুনকারুল হাদীস, তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য।[৩]

সুতরাং আপনার আমলকৃত দু'আটি অর্থের দিক থেকে চমৎকার হলেও এ মর্মে বর্ণিত দু'আটি আমলযোগ্য নয়।

তবে মহান আল্লাহর কাছে বারাকাত চাওয়া এবং রমাযান মাস লাভ করার দু'আ করা যে কোনো মাসেই যথার্থ ও সঠিক। ইনশা আল্লাহ।

☞ প্রশ্ন (২) ঃ রোযা পালনে অক্ষম হলে এর বিনিময়ে একজন মিসিকিনকে খাওয়াতে হবে। কিন্তু যদি খাদ্য দেয়া হয় তাহলে কী পরিমাণ দিতে হবে?

মো: ইবরাহীম খলীল, হারাগাছা, রংপুর।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রতি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনের খাদ্যের পরিমাণ (لكل مسكين نصف صاع) প্রতি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' অর্থাৎ প্রায় সোয়া কেজি পরিমাণ খাদ্য প্রদান করতে হবে।[৪] অবশ্য কিছু বেশী দিতে পারলে অতি উত্তম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : (فمن تطوع خيرا فهو خير له) "যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি প্রদান করবে এটা তার জন্যই কল্যাণকর।"[৫]

☞ প্রশ্ন (৩) ঃ ফিতরা এক সা' দিতে হবে- এই এক সা'র সঠিক মাপ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয় প্রধান খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হবে, প্রশ্ন হলো কিশমিশ, পনির ইত্যাদি কি কোনো দেশে কখনো প্রধান খাদ্য ছিল?

ফাইমুল ইসলাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

উত্তর ঃ ফিতরা এক সা' দিতে হবে। সা' একটি পাত্রের নাম, কোনো ওজনের নাম নয়। এক সা' চার মুদ, এক মুদ হল মধ্যম পর্যায়ের দু'হাতের তালু একত্রে প্রশস্ত করলে যে পরিমাণ খাদ্য ধরে তাই এক মুদ। যা চাউলের বর্তমান ওজনে প্রায় আড়াই কেজি। সা' একটি পাত্র, এ পাত্রে যে ধরনের খাদ্য রাখা হবে সে ধরনের ওজন হবে। অতএব যে পাত্রে চাল রাখা যায় আড়াই কেজি, সে পাত্রে মুড়ি কখনও আড়াই কেজি ধরবে না, এখন সে পাত্রে মুড়ি রেখে যদি বলি যে সা' এর পরিমাণ এক কেজি তাহলে কখনও সঠিক হবে না। সুতরাং এ বিষয়ে অহেতুক বিতর্কে না জড়িয়ে আড়াই কেজি ফিতরা প্রদান করব। এতে যদি একটু বেশিও হয়ে যায়, তাহলে তা খারাপ হবে না, বরং ভাল হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত :

"আমরা নবী ﷺ এর যুগে ফিতরা বের করতাম এক সা খাদ্য অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব, অথবা এক সা' কিশমিশ, অথবা এক সা' পনির। এখনও সে

---

[১] *তাবারানী আওসাত-৩৯৩৯, বাইহাকী শুআবুল ইমাম-৩৫৩৪*

[২] *মীযানুল ইতিদাল-২/৯১*

[৩] *তাহযীবুত্ তাহযীব-৩/৩০৫-৩০৬*

[৪] *সহীহ বুখারী হা : ৪৫১৭*

[৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৪*

ভাবেই ফিতরা বের করি ....।[৬] এ হাদীস বা অন্য হাদীসে প্রধান খাদ্য উল্লেখ আছে বলে মনে হয় না, বরং উল্লেখ রয়েছে "খাদ্য" এবং বর্ণনা রয়েছে উল্লেখযোগ্য খাদ্যের যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির ইত্যাদি।

অতএব, আমরা বলতে পারি, ফিতরা হবে উল্লেখযোগ্য খাদ্য হতে। যে খাদ্য উল্লেখযোগ্য নয় ও সহজলভ্য নয় তা হওয়া উচিত নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞প্রশ্ন (৪) ঃ ঋতুবতীগণ যদি ফজরের পূর্বেই পবিত্র হয় এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে রোযা রাখলে তার রোযা হবে কি?

আছিয়া সুলতানা, ঢাকা।

উত্তর ঃ ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা নারীদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, ধারণা করে যে, পবিত্র হয়ে গেছে অথচ সে আসলে পবিত্র হয়নি। এ কারণে নারীরা আয়িশা রযিয়াল্লা-হু আনহু এর কাছে আসতেন তাদের লজ্জাস্থানে তুলা লাগিয়ে উক্ত তুলার চিহ্ন দেখানোর জন্য যে, তারা কি পবিত্র হয়েছেন? তখন তিনি বলতেন, لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ তোমরা তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ না তোমরা কাছ্ছা বাইযা (বা সাদা পানি) না দেখ। অতএব নারী অবশ্যই ধীরস্থিরতার সাথে লক্ষ্য করবে এবং নিশ্চিত হবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে কিনা। যদি পবিত্র হয়ে যায় তবে সিয়ামের নিয়ত করে নিবে। ফজর হওয়ার পর গোসল করবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নামাযের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত গোসল সেরে নেয়ার চেষ্টা করবে, যাতে করে সময়ের মধ্যেই ফজর নামায আদায় সম্ভব হয়।

আমরা শুনতে পাই অনেক নারী ফজরের পূর্বে বা পরে ঋতু থেকে পবিত্র হয়, কিন্তু তারা গোসল করতে বিলম্ব করে নামাযের সময় পার করে দেয়। পরিপূর্ণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার যুক্তিতে সূর্য ওঠার পর গোসল করে। কিন্তু এটা মারাত্মক ধরনের ভুল। চাই তা রমাযান মাসে হোক বা অন্য মাসে। কেননা তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে সময়মতো নামায আদায় করার জন্য দ্রুত গোসল সেরে নেয়া। নামাযের স্বার্থে গোসলের ওয়াজিব কাজগুলো সারলেই যথেষ্ট হবে। তারপর দিনের বেলায় আবারো যদি পরিপূর্ণরূপে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে, তবে কি অসুবিধা আছে? ঋতুবতী নারীর মতো অন্যান্য নাপাক ব্যক্তিগণ (যেমন স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্ন দোষের কারণে নাপাক) নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করতে পারবে এবং ফজর হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো স্ত্রী সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থাতেই সিয়ামের নিয়ত করতেন এবং ফজর হওয়ার পর নামাযের আগে গোসল করতেন। (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

☞ প্রশ্ন (৫) ঃ যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে সাড়ে সাত ভরি সোনার মূল্যমানকে প্রাধান্য দিতে হবে, নাকি সাড়ে ৫২ ভরি রূপার মূল্যমানকে। অথচ উভয়টির মূল্যমানে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

শামসুল আলম টাইগারপাস, চট্টগ্রাম

উত্তর : বর্তমান বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের নেসাবের মাঝে বিশাল ব্যবধান রয়েছে, এমতাবস্থায় কম নিসাব গ্রহণ করাটাই ভাল বলব। কারণ যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য দরিদ্রের সহায়তা দেয়া, অতএব সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্যের মূল্যকে সঞ্চিত অর্থের নিসাব গণ্য করলে বেশি সংখ্যক দরিদ্রের সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হবে। এ হিসাবে এটা উত্তম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৬) : অনেককে দেখা যায়, সূর্য অস্ত যাওয়া সত্ত্বেও ইফতার করেন না, বরং সংশয় দূর করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েক মিনিট বিলম্ব করেন, এটা কতটুকু সঠিক- অনুগ্রহ করে জানাবেন।

-খোরশেদ মোল্লা- শালিখা, মাগুরা

উত্তর সিয়ামের শেষ সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর[৭] অর্থাৎ, রাতের শুরু হল সিয়ামের শেষ সীমা। আর রাতের শুরু হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ সূর্য অস্ত গেলেই রোযাদার ইফতার করবে।[৮]

অতএব সূর্য অস্তের সময় নিশ্চিত জানা থাকলে তখনই ইফতার করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা অবশ্যই ত্রুটি এবং অকল্যাণকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» মানুষেরা যতদিন সময় হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।[৯]

---

[৬] *সহীহ বুখারী হা : ১৫০৫, সহীহ মুসলিম হা : ৯৮৫*

[৭] *সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৭*

[৮] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৫৪, সহীহ মুসলিম হা : ১১০০*

[৯] *সহীহ বুখারী হা : ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম হা : ১০৯৮*

সুতরাং সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করাই সুন্নাহসম্মত ও কল্যাণকর। অপরদিকে বিলম্বে ইফতার করা হল ইয়াহুদী ও শী'আদের স্বভাব যা অবশ্যই বর্জনীয়।

☞ প্রশ্ন (৭) ঃ ফিতরা কি খাদ্যবস্তু দ্বারা আদায় করতে হবে, নাকি টাকা দিয়ে আদায় করলে হবে? গম, যব, খেজুর, কিশমিস, পনির এগুলো আমাদের দেশের প্রাধান খাদ্য নয়, এগুলো দ্বারা ফিতরা আদায়ের বৈধতা কতটুকু?

শাহরিয়ার কবীর, যশোর

উত্তর ঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা নবী ﷺ এর যুগে এক সা খাদ্য অথবা এক সা খেজুর অথবা এক সা যব অথবা এক সা কিশমিশ দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম।[১০]

এ হাদীসে প্রমাণিত হয় খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের আমল, তাই এটাই হওয়া উচিত।

নাবী ﷺ এর যুগে যেগুলো খাদ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার হত সেসব খাদ্য হতে তারা ফিতরা দিতেন, ঐসব খাদ্য হতে আমাদেরকেও ফিতরা দিতে হবে এমন কথা বলা হয়নি। বরং আমাদের সমাজে যে বস্তু প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি তা হতে আমরা ফিতরা দিব। ওয়ালাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (৮) ঃ ইতিকাফ এর হুকুম ও ফযীলত কিরূপ?

আব্দুল মুমিন, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা

উত্তর : রাসূল ﷺ নিয়মিত ইতিকাফ করেছেন তাই ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে কেউ মানত করলে তার হুকুম ওয়াজিব। আর ইতিফাফ এর নির্দিষ্ট ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তবে নিশ্চয়ই ইতিফাক বড় ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত যেহেতু রাসূল ﷺ অতি গুরুত্বের সাথে পালন করতেন, এছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও বিশেষ ইবাদাতের এক সুবর্ণ সুযোগ হল ইতিকাফ। ওয়াল্লাহু আলাম।

☞ প্রশ্ন (৯) : সিয়ামের নিয়্যাতের জন্য কি আরবী ভাষায় কোনো বাক্য পাঠ করা জরুরি।

-আবুল খায়ের- কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

উত্তর : ইসলামের সকল ইবাদতের জন্য নিয়্যাত করা একটি জরুরি বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন নিয়্যাত কখনও কোনো শব্দ বা বাক্য পাঠের মাধ্যমে হয় না। কারণ এ নিয়্যাতের স্থান হল অন্তর, মুখ নয়।

অতএব, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প করার নামই নিয়্যাত। সুতরাং রামাযানের সিয়ামের জন্য প্রতি রাতে ফজরের পূর্বে আন্তরিক ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেই যথেষ্ট, কোনো শব্দ বা বাক্য পাঠের প্রয়োজন নেই। বরং বাক্য পাঠের মাধ্যমে নিয়্যাত করা বিদআত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

☞ প্রশ্ন (১০) ঃ সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আজান দিয়ে সালাতের সময় হলে তখন সালাত আদায় করা যাবে কি না?

মো : রুবেল, কালকিনি, মাদারীপুর।

উত্তর ঃ আযান হলো ওয়াক্ত হওয়ার ঘোষণা দান এবং মুসল্লিগণকে মসজিদে আসার আহ্বান। ওয়াক্ত হওয়ায় পূর্বে কোনো ওয়াক্তের আযান দেয়া বৈধ নয়, বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়া আললাজনা আদ দায়িমাতে এই প্রসঙ্গে জবাবে উল্লেখিত হয়েছে 'ওয়াক্ত প্রবেশের আগে আযান প্রদান জায়িয নয়। কেউ যদি আযান দিয়ে দেয় আর স্পষ্ট হয় যে, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান হয়েছে তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হবে পুনরায় আযান দেয়া।[১১]

☞ প্রশ্ন (১১) ঃ কোনো হিন্দু ব্যক্তি মসজিদ ও মাদরাসায় দান করলে তার দানের টাকা নেয়া যাবে কি?

নাম : হাসান রেজা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ মসজিদ ও মাদরাসায় কোনো হিন্দু ব্যক্তির অনুদান গৃহীত হওয়া বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কোনো কোনো বিদ্যানের মতে এটি বৈধ নয়। দলীল : মহান আল্লাহর বাণী :

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফুরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।[১২]

কতক বিদ্যানের বক্তব্য হলো মুশরিকদের মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ যেখানে নেই, সেখানে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণে তাদের অনুদান গ্রহণ করা যায় না।

---

[১০] *সহীহ বুখারী হা : ১৫০৮*

[১১] *ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ দায়িমা- ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮১ পৃ.*

[১২] *সূরা আত-তাওবা আয়াত : ৭*

জমহুর উলামার মতে মসজিদ ও মাদরাসায় মুশরিকদের অনুদান গ্রহণ করা যাবে। দলীল : এই বিষয়ে সহীহ বুখারীতে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে হাদীসসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অধ্যায় শিরোনাম হলো- 'باب قبول الهدية من المشركين، মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ বিষয়ক অধ্যায়। উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত, হাদীসে প্রমাণিত যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাসকের কাছ থেকে বিভিন্ন উপহার গ্রহণ করেছেন। তবে মুশরিকদের পূজা পাঠেনর কোনো কিছু গ্রহণ করা যাবে না। মুশরিকদের দান মসজিদ মাদরাসায় গৃহীত হবে মর্মে জমহুরের আরো দলীল হলো- আল্লাহর বাণী :

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়নদেরকে ভালোবাসেন।[১৩]

আয়াতে কারীমায় বিবৃত বিধানের আলোকে কাফেরদের ইহসান দালীলিকভাবে গৃহীত; তাই কাফেরদের স্বেচ্ছাদানও এ আলোকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

☞ প্রশ্ন (১২) ঃ যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায় তা সংক্ষেপে জানিয়ে বাধিত করবেন।

খাইরুল ইসলাম, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তর : যেসব কারণে সিয়াম নষ্ট হয়ে যায় তা নিম্নরূপ : (১) জেনে বুঝে পানাহার করা, (২) স্বামী স্ত্রীর মিলন, (৩) স্বেচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে বীর্যপাত ঘটানো, (৪) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, (৫) মেয়েদের হায়িয ও নিফাস শুরু হওয়া, (৬) জেনে-বুঝে ইফতার বা সিয়াম ভঙ্গ করার দৃঢ় নিয়্যাত করা। (৭) মুরতাদ হয়ে যাওয়া।[১৪]

☞ প্রশ্ন (১৩) : অতি বৃদ্ধ অথবা এমন অসুস্থ যার সুস্থ্যতা আশা করা যায় না এমন ব্যক্তি রামাযান মাসে কী করবে জানাবেন। (রহীম মোল্লা-নবাবগঞ্জ, ঢাকা)

উত্তর : আল-হামদু লিল্লাহ, ইসলাম সহজ, আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যের বাইরে কিছু করতে বাধ্য করেননি। অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণ রামাযান মাসে প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন দরিদ্র মানুষ *হাসাইন* কে খাওয়াবেন। অথবা প্রতি সিয়ামের বিপরীতে একজন দরিদ্র মানুষকে অর্ধ সা (সোয়া কেজি) খাদ্য প্রদান করবেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।[১৫]

☞ প্রশ্ন (১৪) ঃ কবর অন্ধকার ঘর, সাপ বিচ্ছুর ঘর, পোকা মাকড়ের ঘর.... এই কথাগুলো কোন হাদীসের তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

মুরতাজা হোসাইন, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা

উত্তর ঃ এ মর্মে বর্ণিত হাদীস আদৌ সহীহ নয়; বরং খুব দুর্বল এমনকি ভিত্তিহীন।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুগত হাদীসটি তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

বর্ণিত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে মীযানুল ইতিদাল কিতাবে বলা হয়েছে- وهذَا سَنَدُ ضَعِيْفٌ جِدًّا এ সনদ খুবই দুর্বল।[১৭] আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : হাদীসটি মাওযূ।[১৮]

***☞ প্রশ্ন (১৫) ঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর, সেখানে ছাদে কিংবা অযুখানার* ওপর পরিবারসহ ইমাম থাকার আবাসন ব্যবস্থা করা যাবে কি? কুরআন এবং সহীহ হাদীসের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।**

মো: আব্দুল্লাহ মণ্ডল, রংপুর সদর, শালবন মিস্ত্রিপাড়া

উত্তর ঃ মসজিদের ছাদে কিংবা নিচতলায় ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিনের জন্য বাসস্থান বানানো বৈধ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হলো এটি যেন প্রাথমিকভাবে অবকাঠামোগত পরিকল্পনায় থাকে। নচেৎ মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পর, কিংবা মসজিদ নির্মাণের পর নতুন চিন্তার অংশ হিসেবে তা করা বৈধ হবে না, মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অতঃপর সে ব্যক্তি শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তাহলে তার পাপ তাদেরই হবে যারা একে পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮১

---

[১৩] *সূরা আল-মুমতাহিনা আয়াত : ৮*

[১৪] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১০৩-১০৬*

[১৫] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৮৪, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১২৪ পৃ.*

[১৬] *আল-আওসাত-৮/২৭৩*

[১৭] *মীযানুল ইতিদাল-৩/৪৮৭*

[১৮] *আসসিলসিলাতুয্ যায়ীফা- ৪৯৯০*

প্রতিষ্ঠিত: ১৯৪৬ ইং

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত রামাযান-১৪৪৪ হি./২০২৩ ইং সালের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
রামাযান	মার্চ-এপ্রিল			
০১	২৪ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৪৩	০৬ : ১১
০২	২৫ মার্চ	শনিবার	০৪ : ৪২	০৬ : ১১
০৩	২৬ মার্চ	রবিবার	০৪ : ৪১	০৬ : ১২
০৪	২৭ মার্চ	সোমবার	০৪ : ৪০	০৬ : ১৩
০৫	২৮ মার্চ	মঙ্গলবার	০৪ : ৩৯	০৬ : ১৩
০৬	২৯ মার্চ	বুধবার	০৪ : ৩৮	০৬ : ১৩
০৭	৩০ মার্চ	বৃহস্পতিবার	০৪ : ৩৭	০৬ : ১৪
০৮	৩১ মার্চ	শুক্রবার	০৪ : ৩৬	০৬ : ১৪
০৯	০১ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ৩৪	০৬ : ১৪
১০	০২ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ৩৩	০৬ : ১৫
১১	০৩ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ৩২	০৬ : ১৫
১২	০৪ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ৩১	০৬ : ১৬
১৩	০৫ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ৩০	০৬ : ১৬
১৪	০৬ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২৯	০৬ : ১৭
১৫	০৭ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২৮	০৬ : ১৭
১৬	০৮ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ২৭	০৬ : ১৮
১৭	০৯ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ২৬	০৬ : ১৮
১৮	১০ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ২৫	০৬ : ১৯
১৯	১১ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ২৪	০৬ : ১৯
২০	১২ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ২৩	০৬ : ১৯
২১	১৩ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ২২	০৬ : ২০
২২	১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ২০	০৬ : ২০
২৩	১৫ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১৯	০৬ : ২০
২৪	১৬ এপ্রিল	রবিবার	০৪ : ১৮	০৬ : ২১
২৫	১৭ এপ্রিল	সোমবার	০৪ : ১৭	০৬ : ২১
২৬	১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	০৪ : ১৬	০৬ : ২২
২৭	১৯ এপ্রিল	বুধবার	০৪ : ১৫	০৬ : ২২
২৮	২০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	০৪ : ১৪	০৬ : ২২
২৯	২১ এপ্রিল	শুক্রবার	০৪ : ১৩	০৬ : ২৩
৩০	২২ এপ্রিল	শনিবার	০৪ : ১২	০৬ : ২৩

{আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ইসলামিক ফাইন্ডার (ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক সাইন্স, করাচী) এর সময় সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত}

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সাহারীর শেষ ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য	ক্র.	জেলা	সাহারীর শেষ সময়ের পার্থক্য	ইফতারের পার্থক্য
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	(+) ০২ মি. ১২ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	(+) ০০ মি. ০০ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ৪৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.	(+) ০৬ মি. ০৬ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০১ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ২৪ সে.	(−) ০০ মি. ০৬ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ০০ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩৬ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ১২ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ১২ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০০ মি. ০০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ৪২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০১ মি. ১২ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৬ মি. ৪৮ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.	(+) ০৫ মি. ৪২ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৬ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৭ মি. ৩০ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ১৮ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৬ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৭ মি. ৩৬ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ৪২ সে.	(+) ০৪ মি. ১৮ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৩৬ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৫ মি. ০০ সে.	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০২ মি. ৩৬ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৬ মি. ১৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ১২ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.	(+) ০৭ মি. ৪২ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ০৬ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৪৮ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৩০ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ১৮ সে.	(−) ০৩ মি. ৪২ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০৩ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৫ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ৩০ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৪ মি. ০৬ সে.	(−) ০৩ মি. ৫৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ২৩ মার্চ-২০২৩ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

অনুমোদিত

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রতিষ্ঠিত: ১৯৪৬ ইং